বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ দশটি ঘটনা সমীক্ষা

আবু নকি রিজওয়ানুল হক
মোঃ আতাউর রহমান

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
সমীক্ষার যৌক্তিকতা	৫
সমীক্ষার উদ্দেশ্য	৬
সমীক্ষার পরিধি	৬
বিবাহ বিচ্ছেদের সংজ্ঞায়ন	৭
সমীক্ষার পদ্ধতি	৭
উপস্থাপন পরিকল্পনা	৮
সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা	৮
প্রশিক্ষণে এ প্রতিবেদন ব্যবহারের পদ্ধতি	৯
ঘটনা-সমীক্ষা-১ : ছমিরণ	১১
ঘটনা-সমীক্ষা-২ : গোলাপী	১৬
ঘটনা-সমীক্ষা-৩ : জাকিয়া	২২
ঘটনা-সমীক্ষা-৪ : সুফিয়া	২৬
ঘটনা-সমীক্ষা-৫ : কুলসুম	২৯
ঘটনা-সমীক্ষা-৬ : রাহেলা	৩২
ঘটনা-সমীক্ষা-৭ : পুষ্প বেগম	৩৫
ঘটনা-সমীক্ষা-৮ : সখিনা	৩৮
ঘটনা-সমীক্ষা-৯ : মালতি	৪২
ঘটনা-সমীক্ষা-১০: রহিমা - তার দুর্ভোগ, সংগ্রাম ও স্বপ্ন	৪৫
ঘটনা-সমীক্ষার বিশ্লেষণ	৪৯
সুপারিশ	৫৩
গ্রন্থপঞ্জী	৫৪
পরিশিষ্ট (সংশ্লিষ্ট আইন সমূহ) - ১	৫৫
পরিশিষ্ট (ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র) - ২	৮০

মুখবন্ধ/কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য বাস্তব তথ্যসমৃদ্ধ 'কেইস স্টাডি' পরিচালনা করা হয়; বর্তমান প্রতিবেদনটি সেরূপ একটি সমীক্ষার ফসল । কেন্দ্রের তিনটি প্রধান পাঠক্রম ছাড়াও ছোট ছোট কয়েকটি পাঠক্রমে এ প্রতিবেদনটি প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা যাবে বলে আমরা আশা করছি । বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীদের নিয়ে প্রণীত এমন ঘটনা সমীক্ষার সংখ্যা খুবই কম । এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা ঘটনা (Case) সমূহ কেন্দ্রে চলমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করবে, সে বিশ্বাস আমরা পোষণ করি ।

সমকালীন চাহিদানুযায়ী এ গবেষণা প্রস্তাবনাকে অনুমোদন দিয়ে কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে জন্যে কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই ।

এ প্রতিবেদনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো উপস্থাপিত ঘটনা-সমীক্ষাগুলো মাঠ পর্যায় থেকে (নারী যেমন অবস্থায় ছিল) সংগ্রহ করা হয়েছে; তাদের স্ব স্ব ধারা বর্ণনা/বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছে মাত্র । জনাব মো: নাজির আহম্মদ এ প্রকল্পে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত ঘটনা-সমীক্ষাগুলো মুদ্রণ ও কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণ করেছেন । তাঁর এ সহায়তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, এ প্রতিবেদনটির মূল্যায়ন তখনই হবে যখন এটি বিভিন্ন পাঠক্রমের শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিশ্লেষণধর্মী করে তুলতে সক্ষম হবে । অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণ ও মতামতের ভিত্তিতে এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠবে ।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৪

আবু নকি রিজওয়ানুল হক
মো: আতাউর রহমান

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ

ভূমিকা :

বাংলাদেশের মোট দরিদ্র নারীর অধিকাংশই বাস করেন গ্রামে । এদেশে বর্তমানে মোট জনসমষ্টি (১১০ মিলিয়ন)-র অর্ধেক অংশ হলো নারী । পুরুষ শিক্ষিতের হার যেখানে ৩১% সেখানে নারী শিক্ষার হার মাত্র ১৯% । এ নারী সমাজের সামনে রয়েছে হাজারো সমস্যা । যেমন : সনাতনপন্থী ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক বৈষম্য, নিরক্ষরতা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, পরনির্ভরশীলতা ও নেতৃত্ব দেয়ার মত মনোবলের অভাব এবং প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রভৃতি । একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৫০% বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে চাকরির সুযোগের অনিশ্চয়তা এবং পরিবার পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে ।[১] এ সকল কারণেই সমাজে নারীর, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেড়েই চলছে । যৌতুক, বাল্যবিয়ে, একাধিক বিয়ে, তালাক, ধর্ষণ, পাচার, অকালে গর্ভধারণ, ইত্যাদি সামাজিক অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয় নারীকে । এসবের শিকার হয়ে অসংখ্য নারীর সারা জীবন কাটাতে হয় বন্চনার মধ্য দিয়ে । নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ১৯৮৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সে বছর ৪২০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যান । এর মধ্যে যৌতুকের কারণে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের; এসিড দগ্ধ হয়েছেন ১৬ জন । একই বছর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩৪৪ টি । অপহরণ মামলা হয় ৭২০টি । নারী বেচাকেনার ঘটনা ঘটেছে ৩৩টি । তালাকের সংখ্যা ছিল দুই লাখ ।[২]

নারী নির্যাতন বন্ধ এবং নারীর সামাজিক অধিকারকে সুরক্ষার জন্য দেশে বিভিন্ন আইন প্রচলিত রয়েছে । এসব আইন যেমন : যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১, নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এবং এসিড নিক্ষেপ আইন ১৯৮৮ । শুধু কি এ আইন প্রণয়নই সার কথা ? নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর "মহিলা সহায়তা কেন্দ্র" স্থাপন করেছে । এছাড়া মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়

---

১. Why Marriage Break Up (A Study on Divorce in Rural Bangladesh); RDRS : July, 1990. P.4

২. বিচিত্রা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা; ঢাকা : ২২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৩ সেপ্টেম্বর '৯৩/ ১৯ ভাদ্র ১৪০০ । পৃষ্ঠা-৩৮ ।

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে "নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেল" গঠন করে। তার পরেও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদ তার মধ্যে একটি অন্যতম নির্যাতন । যেমন একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০% বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ৫% বিচ্ছেদ ঘটে যৌতুকের কারণে, ১০% স্বামীর যৌন অসামর্থ্যের কারণে এবং ৫% যথাযথ পারিবারিক ভরণ-পোষণের অভাবে । ৮০% বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যৌতুকসহ অন্যান্য কারণে । ৫৫% বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনার ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবী ছিল, ২৫% ক্ষেত্রে যৌতুকের জন্যে স্বামী স্ত্রীকে চাপ দেয় অথবা দৈহিক নির্যাতন করে । ১০% ক্ষেত্রে স্ত্রীর দীর্ঘ-মেয়াদী অসুখের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে । ২০% ক্ষেত্রে স্বামীর যৌনব্যাধি এবং স্ত্রীকে যৌন সন্তুষ্টি প্রদানে অসমর্থ হওয়ার কারণে স্ত্রীর দিক থেকে বিচ্ছেদ ঘটে[৩] ।

অপর এক তথ্যে লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশে ভূমিহীনদের মধ্যে বর্তমানে ২৫% পরিবারের প্রধানই হচ্ছেন মহিলা । কারণ বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা প্রতিদিন বেড়েই[৪] চলছে এবং রোজগারের খোঁজে পুরুষরা প্রায়ই সংসার ত্যাগ করে দূরে চলে যাচ্ছেন। কাজেই প্রশ্ন জাগে গ্রামীণ সমাজের বিবাহ বিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক অবস্থা কি ভূমিকা রাখছে ? স্বামী পরিত্যক্তা নারীগণ অবধারিতভাবে পরিবার প্রধান। নারী প্রধান পরিবারগুলো বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্রই সমাজের দরিদ্রতম অংশ[৫] । সারা পৃথিবীর ১৭-২৮% পরিবার নারী প্রধান । বাংলাদেশে এ ধরনের নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৩.৪৫ মিলিয়ন (১৯৮১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী মোট পরিবারের ২৩%)[৬] । দরিদ্র নারীরা প্রধানত: দু'ভূমিকায় কাজ করেন; ঘরের ভিতরে সাংসারিক কাজ এবং ঘরের বাইরে উপার্জনমূলক কাজ । সাংসারিক কাজ একঘেঁয়ে, কষ্টকর, ধন্যবাদবিহীন এবং জাতীয় আয় পরিসংখ্যানের হিসাবের বাইরে থাকে । উপার্জনমূলক কাজে (ঘরের কাজের উপরি হিসাবে) পুরুষের তুলনায় মজুরী কম, খাটুনীর সময়

---

৩. RDRS. Ibid. P-5

৪. UNICEF : বাংলাদেশের শিশু ও নারী (ঢাকা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, ১৯৯১), পৃষ্ঠা-৫

৫. Michael P Todaro, Economic Development in the Third World (4th Edition), New York & London; Longman, 1989). P-163.

৬. Report of the Task Force on Bangladesh Development Strategies for the 1990's. Vol-I (Dhaka), P-36

দীর্ঘতর এবং অবকাশের সময়কে যূপকাঠে বলি দিয়ে সংসারের জন্য যে উপার্জন করেন, তা স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তিকে পঙ্গু করে দেয়[৭]। কাজেই লক্ষ্য করা যায় স্বামী পরিত্যক্তা এ নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কতটুকু ভূমিকা রাখছে ।

Marriage, Separation and Divorce গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, "Persons who enter into a Muslim marriage in Bangladesh are subject to Muslim divorce Law:In this Society the husband has the right to divorce his wife without assigning specific reasons. This type of divorce is effected when the husband simply pronounces talaque thrice".[৮] অর্থাৎ একজন মুসলিম পুরুষ তার স্ত্রীকে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন, সেক্ষেত্রে একজন মুসলমান ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিনবার 'তালাক' কথাটি বললেই হলো । সুতরাং এখানেও লক্ষ্য করা যায় যে, দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিয়ম খুব বেশী মাত্রায় কার্যকরী হতে পারে যেখানে গ্রামীণ নারীদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে অশিক্ষিত এবং সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ ।

বাংলাদেশে প্রায় সব মেয়েরই বিয়ে হয় । আইনানুযায়ী পুরুষদের গড় বিয়ের বয়স ২৫ এবং মেয়েদের ১৮ বছর । তবে বাল্য বিবাহের কারণে ৬৬% প্রথম সন্তানের জননীর বয়স ১৮ এর কম[৯]। বাংলাদেশ ফার্টিলিটি সার্ভে, ১৯৯০ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে এদেশের পুরুষ ও মেয়েদের গড় বিয়ের বয়সের পার্থক্য মোটামুটি ৭.৫ বছর এবং স্বামী-স্ত্রীর বয়সের এরকম পার্থক্যের কারণেই ইদানিং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা এত বেড়েছে[১০]।

---

৭. Michael P Todaro, Economic Development in the Third World, Ibid, P-163

৮. Asuthosh Mookerzee, Marriage Separation and divorce (Calcutta; S.C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd. (1986), P-80

৯. Selected Statistical Series, January, 1992, G.D.B and UNICEF,Dhaka

১০. বিচিত্রা, Ibid, P-13.

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের (২) দফায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী - পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করবে[১১] । এর সংগে সঙ্গতিহীন আইন কানুন সংশোধন করে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে । নারীর অধিকার রক্ষায় এবং নির্যাতন রোধের জন্য যে সকল আইন কানুন প্রবর্তিত হয়েছে, তার কতটা জনগণ - বিশেষত: গ্রামের ও শহরের বস্তির অশিক্ষিত জনগণ এবং নারীগণ জানেন ? ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি যে মর্যাদা ও অধিকার ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে, তার কতটাই বা সবাই জানে ? কতটা পালন করে ? বিয়ে এবং তালাকের ব্যাপারে যে উঁচু মাত্রার সাবধানতা ও দায়িত্ববোধ অর্পিত আছে, তার কতটা পালিত হচ্ছে ? সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের যে সালিশ হচ্ছে, তার মধ্যে ন্যায়-নীতি, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আইন ও ধর্মীয় নির্দেশ কি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে ? সালিশ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি কি বঞ্চনা করা হচ্ছে না ? শঠতার আশ্রয় প্রশ্রয় দরিদ্র নারীকে কি অধিকার থেকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত করছেনা ? গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় নেতৃত্ব কি বিবাহ বিচ্ছেদ প্রশ্নে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসছে, নাকি উপেক্ষা ও দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালন করছে ? শহরে বস্তি এলাকায় বসবাসকারী ছিন্নমূল নারীরা কি বিভিন্ন বৈষম্য ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন না ? যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে গ্রামের দরিদ্র নারীরা বাস করছেন, সামাজিক পরিবর্তনের যে সকল প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর যে অবস্থা বলবৎ আছে, যে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের শিকার হয়ে গ্রামবাসী বহু শতাব্দীর অভ্যস্ত সামাজিক জীবন ত্যাগ করে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে এবং বস্তির জীবনে দু:স্বপ্ন ভাঙ্গার হাহাকারে বাতাস ভারী করে তুলছে, বিবাহ বিচ্ছেদের মত সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার উপর এ সব পরিবর্তন, ঘটনা ও প্রবণতার সরাসরি প্রভাব লক্ষ্যণীয় ।

ব্যাপক দারিদ্র্য অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অশুভ ফল নারীকে বহন করতে হয় পুরুষের চেয়ে বেশী । বহু শতাব্দী ধরে অবিচার, বঞ্চনার শিকার তাঁরাই হচ্ছেন বেশী । নারীর প্রতি সনাতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নেতিবাচক, বৈষম্যমূলক ও উৎপীড়নদায়ক । এটা আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ।

---

১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ।

৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়সের মহিলাদের মধ্যে শতকরা ১৭.৪ জনই হয় বিধবা না হয় বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার অথবা স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকছেন । এই একা-নারীদের বেশীরভাগই জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে বাড়ীর বাইরে বেরিয়েছেন । অপর এক তথ্যে দেখা যায়, তালাকপ্রাপ্তাদের মধ্যে ৫০% নারী আয় উপার্জনমূলক কর্মকান্ড যেমন: হাঁস-মুরগী পালন, কাঁথা তৈরী, সেলাই এবং মজুরী-শ্রম প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিল । পরিবর্তনশীল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সংসারের কর্ত্রী ।[১২]

এ গবেষণা সমীক্ষায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস - এগুলোর মধ্যে কি ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে । বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত আইন এ বিষয়ে কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা রাখছে তা অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে ।

বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক পরিবেশে বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হয়ে এই মহিলাগণ নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে কতটা এবং কিভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছেন, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এ সমীক্ষায় ।

<u>সমীক্ষার</u> <u>যৌক্তিকতা</u> :

বাংলাদেশ সরকার উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন । বাংলাদেশ সরকারের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম সাধারণ কৌশল হচ্ছে নারী উন্নয়নকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করা ।[১৩] এমনকি দেশে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বিদেশী সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহও (NGOs) তাদের কার্যক্রমে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে । অর্থাৎ তারা দারিদ্র দূরীকরণে প্রথমেই গ্রামীণ নারীদেরকে লক্ষ্যগোষ্ঠী (Target Group) হিসেবে চিহ্নিত করেছে ।

---

১২. বিচিত্রা, Ibid, P-10

১৩. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (খসড়া) ১৯৯০-৯৫, পৃষ্ঠা-I-4

নারীরা তুলনামূলকভাবে পুরুষদের চেয়ে উন্নয়ন তৎপরতায় যেমন : ঋণ গ্রহণ/ব্যবহার ও সমবায় কাজে (গ্রামীণ ব্যাংক, স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী, বিআরডিবি প্রকল্প সমূহে) বেশী সফল । তাদের দলগত এ গতিশীলতাকে গ্রুপভিত্তিক পরিকল্পনায় একীভূত করলে অধিকতর সুফল আনয়ন করবে বলে পরিকল্পনাবিদদের ধারণা ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত নারী উন্নয়ন কৌশলকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে গেলে প্রথমেই নারীদের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে যা পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ-বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীবৃন্দ তাঁদের পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়নে প্রাক-ধারণা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন । এ গবেষণা সমীক্ষা এরূপ একটি প্রচেষ্টা যা দরিদ্র তালাক প্রাপ্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা উদঘাটনের মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে ।

এছাড়া, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে এসব মহিলার জীবনালেখ্য 'কেইস স্টাডি' পদ্ধতিতে বিশ্লেষনের জন্য ব্যবহৃত হবে, যা বাস্তব তথ্য হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের অনুকূলে দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে সক্ষম হবে । প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে তাদের কর্মক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে, প্রকল্প গ্রহণে ও কর্মসূচী প্রণয়নে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নারী উন্নয়নে সহায়ক হবে ।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য :

১) বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের অবস্থান, আইনের বিধান, আইন পালন করা হচ্ছে কতটুকু, এবং আইনের শাস্তিমূলক দিক কোন প্রভাব বিস্তার করছে কিনা সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা ;
২) বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার নারীদের বর্তমান অবস্থা, জীবন-যাপন, আত্মনির্ভরশীতার প্রচেষ্টা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংগে সম্পৃক্ততা অনুসন্ধান করা;
৩) প্রাপ্ত ঘটনা সমীক্ষাবলী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহারোপযোগী করা এবং বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সংগে সম্পৃক্ততা নির্ণয়ের অবকাশ সৃষ্টি করা;
৪) প্রাপ্ত ঘটনা (Case) সমূহের আলোকে নারী নির্যাতন রোধে ও নারী উন্নয়নে নীতি নির্ধারণের ধারণা প্রদান করা ।

সমীক্ষার পরিধি :

"বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ" নামক ঘটনা সমীক্ষায় ২০-৪০ বছর বয়সের স্বামী পরিত্যক্তা ১০ জন মহিলার ঘটনা সমীক্ষা (জীবনী) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও সামাজিক প্রথা, সংশ্লিষ্ট আইন বিবাহ বিচ্ছেদে কতটুকু ভূমিকা রাখে এবং আদৌ রাখে কিনা তা নির্ণয় করার চেষ্টা

করা হয়েছে । কয়েকটি ঘটনা সমীক্ষায় বিবাহ বিচ্ছেদে যৌতুক প্রথার ভূমিকা কি সেটি তুলে ধরা হয়েছে । তাছাড়া বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সামাজিক নেতৃত্ব, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ভূমিকা নির্ণয়সহ নারীর অজ্ঞতা ও অসহায়তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণায় । বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার গ্রামীণ মহিলারা আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে কিনা, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

<u>বিবাহ বিচ্ছেদ (DIVORCE)-র সংজ্ঞায়ন</u> :

১.০ Encyclopedia Britannica অনুযায়ী Divorce হচ্ছে "The Act by which a valid marriage is dissolved usually freeing the parties to remarry".

২.০ Academic American Encyclopedia (1983) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী Divorce হচ্ছে "It is a way of dissolving a legal marriage, which permits the partners to remarry if they choose".

৩.০ বর্তমান সমীক্ষায় ব্যবহৃত বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce) এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে :

৩.১ রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহ বিচ্ছেদ : যে সকল নারী-পুরুষের বিবাহ রেজিস্ট্রীকৃত (আইন সম্মত) এবং একইভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে তাকে বুঝান হয়েছে ।

৩.২ রেজিস্ট্রী বিহীন বিবাহ বিচ্ছেদ : যে সকল নারী-পুরুষের বিবাহ রেজিস্ট্রীকৃত নয় (আইন বহির্ভূত) এবং একই ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে তাকে বুঝান হয়েছে ।

৩.৩ বিচ্ছিন্ন অবস্থা : যে সকল নারী-পুরুষের বিবাহ রেজিস্ট্রীকৃত অথবা রেজিস্ট্রীবিহীনভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এক বছরের উর্ধ্বে ভরণ-পোষণ না দেয়া এবং কোন প্রকার খোজখবর না নেয়ার মত ঝুলন্ত অবস্থা বিরাজমান তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

<u>সমীক্ষার পদ্ধতি</u>

সমীক্ষার ধরন : বর্তমান সমীক্ষাটি জীবনালেখ্যমূলক বিশ্লেষণধর্মী ঘটনা সমীক্ষা ।

নমুনা এলাকা : ঢাকা, মানিকগঞ্জ, বগুড়া, ফরিদপুর, নওগাঁ ও ময়মনসিংহ জেলা-সমূহকে নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয় ।

নমুনায়ন : এ সমীক্ষায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে । শুধুমাত্র অনুর্ধ ২০-৪০ বছর বয়সের ১০ জন তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা বিত্তহীন মহিলার সাক্ষাৎকার/জীবনী গ্রহণ করা হয়েছে । কেননা, গবেষণার বিষয়টি এমনই যে, এতে অন্য কোন নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যথার্থ হতো না ।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি : এ সমীক্ষায় মাঠ পর্যায়ে নির্বাচিত মহিলাদের সরাসরি (নারী যেখানে যে অবস্থায় আছে) সাক্ষাৎকার তথা মহিলাদের প্রদত্ত ধারা বিবরণী গ্রহণ করা হয়েছে ।

উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম : মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে একটি প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং উত্তরদাত্রীদের সংগে বিভিন্ন আলাপচারিতার মাধ্যমে ঘটনা সমীক্ষা গঠন করা হয়েছে । তাছাড়া, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের বিবাহের কাবিননামা, তালাকপত্র, মোকদ্দমার আরজি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন কানুন ও বিধি বিধান পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা মাধ্যমিক উৎসের উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত ।

উপস্থাপন পরিকল্পনা :

এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণধর্মী ঘটনা সমীক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে । এর প্রথম অধ্যায়ে পটভূমি, যৌক্তিকতা, পরিধি, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০টি ঘটনা সমীক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে । তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে । পাঠকের সুবিধার্থে বিষয় সম্পর্কিত আইন কানুন, ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র প্রভৃতি পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে । প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস অব্যাহত রাখার মানসে এই ঘটনা সমীক্ষায় কোন সুপারিশ ও উপসংহার সংযুক্ত করা হয়নি ।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা :

এ সমীক্ষার ধরন বা প্রকৃতি অনুযায়ী যে সময়সীমার প্রয়োজন ছিল তা এই গবেষণা কাজে পাওয়া যায়নি । অত্যন্ত কম সময়ে এ গবেষণাটি সমাপ্ত করতে হয়েছে । তাছাড়া, এ ধরনের বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বল্পতা বিরাজমান ছিল ।

সময় ও বাজেট কম হবার ফলে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত লোকবলও তেমন ছিলনা । প্রকল্প পরিচালক ও সহযোগী গবেষক নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে উপাত্ত সংগ্রহে রত ছিলেন । উপর্যুক্ত তিনটি প্রধান সীমাবদ্ধতা এ গবেষণা কাজকে কিছুটা ব্যাহত করেছে । তা নাহলে এ সমীক্ষাটি আরও পরিব্যাপ্ত হতে পারতো ।

প্রশিক্ষণে এ প্রতিবেদন ব্যবহারের পদ্ধতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র অশিক্ষিত নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত দিক দিয়ে যে করুণ অবস্থা বিদ্যমান তা খতিয়ে দেখা বা দেখার সুযোগ সৃষ্টি করাই হলো এ ঘটনা-সমীক্ষার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত ঘটনা-সমীক্ষাগুলো পাঠ করলে এবং এর সাথে দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করলে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থা ও প্রচলিত আইন এ বিষয়ে কি এবং কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা' নির্ণয় করা সহজ হবে বলে আশা করি। এ কথাও বলে নেয়া প্রয়োজন যে, এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কোন চূড়ান্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত নির্দেশ করবে না এবং তা' সমগ্র বাংলাদেশের নারীদের জন্য হুবহু প্রযোজ্য নাও হতে পারে। ঘটনা-সমীক্ষাগুলো কেবল আলোচনা ও বিশ্লেষণের সূত্রপাত করবে, অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সাহায্য করবে এবং নতুন করে চিন্তা ভাবনার পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

এ প্রতিবেদনে সংগৃহীত সবগুলো ঘটনা-সমীক্ষাই বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে (যেখানে যে অবস্থায় নারী) প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে নজর দিয়েই জীবনীমালার প্রধান চরিত্রের নাম বদলে দেয়া হয়েছে। ঘটনা-সমীক্ষা অনুশীলনী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম বলা যেতে পারে। পাঠকের কাছে ঘটনা-সমীক্ষাগুলো তথ্যের দিক থেকে কিছুটা অসম্পূর্ণ বলে মনে হতে পারে। কেননা, সার্বিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ কাজ হিসেবে প্রতিভাত ছিল। তাছাড়া অনেকটা ইচ্ছে করেই এ গুলোকে ওভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে; শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে চিন্তা করে। তা'নাহলে এ ঘটনা-সমীক্ষা নিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ থাকতোনা।

এ প্রতিবেদনে ১০টি ঘটনা-সমীক্ষাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলোর প্রত্যেকটি পাঠ করার শেষে পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন জাগবে। তিনি প্রতিটি প্রশ্নের জবাব চিন্তা করবেন। স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে স্ব স্ব জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন এবং নতুন কোন প্রশ্নের উদয় হলে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও আলোচনা করবেন। ইচ্ছে করেই ঘটনা সমীক্ষাগুলোর শেষে কোনও প্রশ্ন সংযুক্ত করা হয়নি।

এ প্রতিবেদনের প্রতিবেদকদ্বয় মোট ১০টি ঘটনা-সমীক্ষা উপস্থাপন করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে কিছু বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পাঠকগণ এ বক্তব্যের সাথে একমত হতেও পারেন নাও হতে পারেন। যদি পাঠকগণ একমত না হন, তাহলে তাঁদের সব সব বিশ্লেষণ দেবেন। শুধুমাত্র তখনই প্রশিক্ষণ উপাদান হিসেবে ঘটনা সমীক্ষাগুলোর প্রকৃত উপযোগিতা বের হয়ে আসবে।

এ ঘটনা-সমীক্ষার ওপর অনুশীলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এক বা একাধিক প্রশিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক শ্রেণীকক্ষে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে অংশগ্রহণকারীগণ স্বতপ্রণোদিত হয়ে আলোচনায়/অনুশীলনীতে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ প্রয়োজনে প্রশিক্ষক এখানে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। শ্রেণীকক্ষ অধিবেশনের পর বাস্তবে এ রকম কেস সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মাঠ পরিদর্শনের (বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/নারী নির্যাতন সেল/মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র/এন,জি,ও) ব্যবস্থা থাকতে পারে।

ছমিরণ

বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে ছমিরণ বেগম বেশ পরিচিত একটি নাম । আরেকটি পরিচয় হচ্ছে সে আরডিএ এর কর্মী জনাব সামাদ এর'মা । পরিচিত এজন্যে যে, তার জীবনে বয়ে গেছে সমুদ্রের অজস্র ঢেউ এর মত দু:খ কষ্ট আর যাতনা ! যে সময়টাতে তার গৃহিনী হিসেবে বাড়ীতে বসে সংসার করার কথা, সেখানে সে মানুষের ঘরে ঘরে কাজ করে দিনাতিপাত করছে । এ ছাড়া যে কাজ তাকে করতে হচ্ছে, তা আরডিএ'র কৃষি খামারে বছরে ২ মাস । কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন তাকে কৃষি খামারে, মানুষের বাড়ী বাড়ী কাজ করতে হয় ? তার বয়স্ক, সমর্থ, চাকরিজীবী পুত্র থাকা সত্বেও কেন তাকে ফুফুর বাড়ীতে অবস্হান গ্রহণ করতে হয়েছে । কেন নিজের বাড়ীতে তার ঠাঁই নেই ।

ছমিরণ এর বর্তমান ঠিকানা প্রযত্নে, মো: রহমত উল্ল্যাহ (ছমিরণের ফুফা, গ্রাম দড়িপাড়া, ডাকঘর - আরডিএ, ইউনিয়ন - গাড়িদহ, থানা - শেরপুর, জেলা - বগুড়া । ছমিরণের পিতার নাম মুহিত পরামানিক, গ্রাম - ধর্মগ্রাম, থানা - শেরপুর, জেলা -বগুড়া । এতো গেলো তার বর্তমান ও স্হায়ী ঠিকানা ।

ছমিরণের বর্তমান বয়স ৩৯ বছর । তার বিয়ে হয়েছিল দু'বার । প্রথম বার আনুমানিক ১৯৬৭/৬৮ সনে । সঠিক বছর তার মনে নেই, তবে সংগ্রামের কয়েক বছর আগে, তখন আট আনায় এক সের চাল কেনা যেতো । তার ফুফু এ বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন । গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্হিতিতে এ বিয়ে সম্পন্ন হয় যার রেজিষ্ট্রি হয় শেরপুর কাজী অফিসে। /Reg. ছমিরণের প্রথম এই স্বামীর নাম নবিরুদ্দিন - একই গ্রামের বাসিন্দা । পেশায় সে ছিল কৃষিজীবী এবং পরবর্তীতে রিক্সা চালাতো ।

নবিরুদ্দীনের সাথে ছমিরণের বিবাহ হবার পর ১৯৭২ সালে তাদের সংসারে প্রথম সন্তানের জন্ম হয় যার নাম সামাদ - তার বর্তমান বয়স ২২ বছর । সে এখন আরডিএ-তে চাকরী করছে । সে বিবাহিত এবং তার সংসারেও তার মা ছমিরণের ঠাঁই মিলেনি ।

ছমিরণ এবং নবিরুদ্দীন একত্রে সংসার করেছে বেশ কিছু কাল । তাদের সন্তান এসেছে । কিন্তু সংসার টিকেনি । কারণ নবিরুদ্দিনের সংসার ছিল যৌথ পরিবার । সদস্য সংখ্যা ছিল বেশী । ছিল তার মা, ভাই, বোন । মাসিক ব্যয় তার একার পক্ষে বহন করা

সম্ভব হচ্ছিলনা । সে সময়ে ছমিরণ কোন কাজ করতো না ফলে এক জনের পক্ষে সংসারের ব্যয় মেটানো সম্ভব হতো না । আর তাই তার সংসারে ভরণ-পোষনের অভাব দেখা দেয় । এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হতো । ছমিরণ পরিবার চালানোর জন্যে চাল, ডাল, অর্থ চাইলে অনেক সময়ই স্বামী তাকে প্রহার করতো, বকাবকিও করতো । অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের জীবন চলতে থাকে । এক পর্যায়ে নেমে আসে ছমিরণের উপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন ।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায় এ নির্যাতনের ফলেই কি ছমিরণের ববাহ বিচ্ছেদ ঘটে ? জবাবে ছমিরণ বলে এখানেই শেষ না । স্বামী নবিরুদ্দীন অন্যের পরামর্শে তাকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । অথচ এই নবিরুদ্দীন নিজেই একদিন ছমিরণকে পছন্দ করে স্ত্রী হিসেবে ঘরে তুলে নিয়েছিল । কিন্তু আরো দু:খজনক এই যে, বিয়ের পর থেকেই ছমিরণ লক্ষ্য করেছে তার শ্বশুরালয়ে প্রায় সকলে; বিশেষভাবে তার শাশুড়ী তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি । যার ফলে স্বামী মানসিকভাবে ছমিরণের প্রতি ক্রমেই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়তে থাকে । শুধু তাই নয়, ছমিরণকে তালাক দেয়ার জন্যে তার শাশুড়ী ক্রমাগতভাবে ছেলেকে উস্কানি দিতে থাকে । ফলে একদিকে ভরণ-পোষণের অভাব ও স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা, অন্যদিকে নবিরুদ্দীনের মা'র নেতিবাচক ভূমিকা এই সংসার ভাঙার পথ উন্মুক্ত করে দেয় । ১৯৭৩ সালে তাই ছমিরণের প্রথম স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ।

এখন প্রশ্ন জাগে, বিবাহ বিচ্ছেদ কিভাবে হয়েছিল ? প্রথম স্বামী ছমিরণকে তালাক দিয়েছে এমন একটি কথা সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে গ্রামের মাতব্বর জনাব আইসনার নিকট প্রেরণ করে যার মধ্যে তিন মাসের সময় উল্লেখ করে দেয়া হয় । অথচ জনাব আইসনা এ পত্রটি ছমিরণের নিকট উপস্থাপন করে উল্লিখিত তিন মাস পর (যে তারিখে স্বাক্ষর করেছে) । এছাড়া কোন শালিস বা বিচার হয়নি । এই আইসুনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ছমিরণ জানায়, আইসুনা গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি । তার আছে প্রচুর জমা জমি, আর্থিক দিক দিয়ে বেশ ধনী এবং ক্ষমতার দিক থেকেও গ্রামে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী । কাজেই তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামে আর কোন সালিশ বসেনি । আইসুনার উপদেশ মতই যেহেতু তিন মাস পেরিয়ে গেছে, কাজেই আর কোন আইনের আশ্রয় নেয়ার অবকাশ নেই ।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর ১ম পুত্র সন্তানকে নিয়ে ছমিরণ বগুড়া শহরের মেসে-মেসে রান্নার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। সে সময় ছমিরণ তার চাচার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। চাচী ছমিরণকে দ্বিতীয় বিয়ে দেয়ার জন্য স্বামী খুঁজতে থাকেন।

ছমিরণের জীবনে কিছুটা আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়, যখন তার চাচী দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করে। ১৯৭৬ সালে চাচীর উদ্যোগে জনাব লাল মিয়ার সাথে ছমিরণের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। লাল মিয়ার সাথে চাচীর বাড়ীতে অবস্থানকালীন ছমিরণের পরিচয় ঘটে এবং সেই থেকে এ বিবাহ হয়। লাল মিয়ার পেশা ছিল মিস্ত্রী, গ্রাম গোপালপাড়া, পো:- পঞ্চগড়, থানা- পঞ্চগড়, জেলা-দিনাজপুর। লালমিস্ত্রী চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিল। চিঠি পড়তে পারতো। বিয়ের পর থেকে ছমিরণের দ্বিতীয় স্বামী লালমিস্ত্রীকে নিয়ে নতুন সংসারের জীবন যাপন শুরু হলো; সাথে থাকলো আগের সংসারের পুত্র সামাদ। ১৯৮০ সালে ছমিরণের সংসারে দ্বিতীয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করে যার বর্তমান বয়স প্রায় ১৪ বছর। স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে সে। 2nd Marriage

এভাবেই ছমিরণের এক এক করে দু'টি সংসারের জন্ম নেয়। কিন্তু টেকেনি একটিও। দ্বিতীয় বিয়ের পর ছমিরণ তার স্বামীসহ তিন বছর সংসার করে কোনও সমস্যা ছাড়াই। এরপর হঠাৎ একদিন লালমিস্ত্রী কাজের সন্ধানে বগুড়া ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। অনেকদিন কোন খোঁজখবর না পেয়ে ছমিরণ তার সন্তানকে সাথে নিয়ে স্বামীর খোঁজে ঢাকায় আসে। স্বামীকে খুঁজে বের করে। লাল মিয়া তাকে বগুড়া ফিরে যেতে বলে এবং সে শীঘ্রই বগুড়ায় সংসারের খরচাপাতি নিয়ে আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু ছমিরণ আস্থা পায়না স্বামীর কথায়। এক প্রকার জোর করেই লাল মিয়ার সংগে ঢাকায় একটি বছর কাটিয়ে দেয়। এরপর দ্বিতীয় বাচ্চাকে পেটে নিয়ে বগুড়ায় ফুফু'র বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেই তার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম লাভ করে। কিন্তু সন্তানের জন্ম সংবাদ পেয়েও তার স্বামী লালমিয়া একবারের জন্যেও ঢাকা থেকে বগুড়ায় দেখতে আসেনি। আর তাই ছমিরণ ক্ষোভে দু:খে ২০ দিনের বাচ্চা নিয়ে ঢাকায় স্বামীর কাছে ছুটে যায়। ঢাকায় স্বামীর সাথে আবার প্রায় এক বছর থাকার পর, স্বামীর উপদেশে পুনরায় বগুড়ায় ফুফু'র বাড়ীতে ফিরে আসে সংগে লাল মিয়াও আসে। এবার স্বামী-লালমিয়া ছমিরণকে বুঝিয়ে, বগুড়ায় রেখে ঢাকায় ফিরে যায় কাজের সন্ধানে। আশ্বাস দেয়, মাঝে মাঝে বগুড়া আসবে

আর সংসারের খরচপাতি নিয়মিত পাঠাবে । পরবর্তীতে বাচ্চার বয়স যখন দেড় বছর হয় তখন একবার দেখতে আসে বগুড়ায় । কয়েকদিন বগুড়ায় থাকার পর পুনরায় সে ঢাকা চলে যায় । এবার আর ফিরে আসেনি । অর্থাৎ ১৯৯১ সাল থেকে লালমিস্ত্রী ছমিরণের আর কোন খোঁজখবর নেয়নি, কোন তালাক নামা কিম্বা কোন শালিসের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়নি ।

কেন এরূপ হলো - এ প্রশ্নের জবাবে ছমিরণ বলে লালমিস্ত্রী পুনরায় আরেকটি বিয়ে করেছে এবং ঐ বউকে নিয়ে পঞ্চগড়ে তার বাড়ীতে চলে গেছে । দু'জন স্ত্রীকে দুটি সংসারের ভরণ-পোষণ প্রদান করা লালমিয়ার পক্ষে সম্ভবপর নয় ।

ছমিরণের সংগে লালমিয়ার যে বিয়ে হয়েছিল, তার রেজিষ্ট্রি হয়েছিল বগুড়ায় কাজী অফিসে, এতে তার চাচা-চাচী সহ বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । এ বিবাহে দেনমোহর ধরা হয়েছিল ২০০০.০০ টাকা ।

কিন্তু ছমিরণের তালাক যেহেতু হয়নি সেহেতু তার দেনমোহরের সমুদয় অর্থ ২০০০.০০ টাকাও সে ফেরত পায়নি । এর জন্যে সে কোনরূপ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেনি । প্রশ্ন জাগে তাহলে সে কি আইন সম্পর্কে অবগত ছিলনা । জবাবে ছমিরণ বলে, লিখিতভাবে তালাক দিলে তিন মাস হয়ে গেলে আর কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না । এই টুকুই জানে মাত্র, এর বেশী কিছু নয় ।

আইনের আশ্রয় নিতে নিষেধ করেছেন ছমিরণের চাচা-চাচী, বিশেষ করে চাচী যিনি এ বিয়েতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন । কেননা স্বামী ছমিরণকে ছেড়ে দিয়ে দূরে পঞ্চগড়ে অবস্থান করছে । তারও আর্থিক অবস্থা ভাল নয় । কোর্ট কাচারির ঝামেলা অনেক, খরচও বহু । তাছাড়া স্বামীর মন ফিরে গিয়েছে তার উপর থেকে, তার নিজের সন্তানের উপর থেকে, তাকে কি আর ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে । তার বিশ্বাস হয়না, তার আস্থা হয়না ।

এমতাবস্থায় ছমিরণ পুনরায় তার দু'সন্তান নিয়ে তার ফুফু'র বাড়ী বগুড়ার শেরপুরে ফিরে আসে । সেখানেই বর্তমানে অবস্থান করছে । তৃতীয় বিয়ের জন্যে অনেকেই বলেছিল, কিন্তু ছমিরণ তার রাজি হয়নি বলে জানায় । ছমিরণের সংসারে বর্তমানে আছে তার দ্বিতীয় পুত্র, যার বয়স ১৩/১৪ চলছে । ছমিরণ তার সংসার চালাচ্ছে কিভাবে জানতে চাইলে বলে, বর্তমানে সে আরডিএ-র কর্মকর্তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে কাজ করে দেয় । প্রতি বাড়ীতে মাসিক ১৫০.০০ টাকা বেতন পায়, মাসে ৬০০/৭০০ টাকা হয় । খাবারের ব্যবস্থাও হয়ে যায় । এছাড়া সে বছরে ২ মাস আরডিএ'র কৃষি খামারে বিভিন্ন রকম কাজ করে মাসিক ৭০০.০০ টাকা হারে বেতন পায় । ছমিরণের বড় ছেলে সামাদ মাঝে মাঝে খাবার বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী তাকে দিয়ে থাকে । প্রয়োজনের মুহূর্তে কিছু কিছু সাহায্য সহায়তা ছমিরণ তার ফুফুর বাড়ী থেকেও পেয়ে থাকে । ছমিরণ জানায় আরও অনেক মেয়ের কথাই সে জানে - যাদেরকে তার স্বামীরা ছেড়ে চলে গেছে । তালাকও দেয়নি, খোঁজখবরও রাখেনা, ভরণপোষণ করে না । পুরুষটি নতুন সংসার করে অন্য কোথাও বসবাস করছে । সালিশ বিচারে তাদের কিছু হয়না । ছমিরণের ক্ষোভ; কিন্তু যদি মেয়েদের একটিও দোষ হয়, কেউ ছাড়ে না ।

গোলাপী

গোলাপী এখন ঢাকায় । সে ট্রেনেই ছিল । আজ ভোরে কমলাপুর ষ্টেশনে পেঁীচেছে । লালমনিরহাট থেকে ঢাকা, দীর্ঘ ভ্রমণের পর তার চোখে মুখে ছিল ক্লান্তির ছাপ । বেলা ১১.০০ টা নাগাদ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বারান্দায় তাকে অপেক্ষা করতে দেখা যায় । সংগে ছিল কেইসের কাগজপত্র । প্রশ্ন জাগতে পারে : গোলাপী কেন ঢাকা ছুটে এসেছে সুদূর লালমনিরহাট থেকে ? কি তার সমস্যা ? কার বিরুদ্ধে তার নালিশ ?

এ সবের জবাব পেতে গেলে ফ্লাশ ব্যাক করতে হবে কয়েক বছর পেছনে । তার জীবন থেকে খসে গেছে যে দশটি বছর, তার ঘটনা প্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে হবে । গোলাপীর মুখ থেকেই শোনা যাক তার দু:খের কাহিনী ।

গোলাপীর বাবার নাম আবদুল মতিন, সাকিন বাড্ডা, থানা- সিংগাইর, জেলা- মানিকগঞ্জও । কিন্তু বহু বছর যাবৎ আবদুল মতিন লালমনিরহাটে ছোট একটি মনিহারী দোকান চালান । গোলাপীর বড় বোন আঙ্গুরী বেগমের স্বামী খায়রুল ইসলাম রেলওয়েতে চাকুরি করেন এবং লালমনিরহাটে সরকারী কোয়ার্টারে বসবাস করেন । মতিন সেখানেই মেয়ের সংসারে থাকেন । দেশে বাড়ী ঘর সম্পত্তি নেই বললেই চলে, যোগাযোগও না থাকার মতই ।

লালমনিরহাটে দেশের যে কোনও লোক দেখলেই মতিন তার খবরাখবর নিতেন । এভাবেই আওয়াল নামে একজন যুবকের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে যে মনিহারী দ্রব্যাদি ফেরি করত । কথায় কথায় জানতে পারেন তার বাড়ী মানিকগঞ্জও জেলার কৃষ্ণপুর উত্তরপাড়া গ্রামে । তার পিতা বাড়ীতে থাকেন ও হাল গেরস্থের কাজ করেন । ছেলেটিকে তাঁর পছন্দ হয় এবং ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গোলাপীর সংগে তার বিয়ে দেন ।

এ বিয়ের প্রধান উদ্যোক্তা আবদুল মতিন নিজে ও তাঁর প্রথম জামাই খায়রুল ইসলাম । ঐ সময় গোলাপীর বয়স আঠার বছর আর আওয়ালের বয়স আঠাশ । গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মুসলিম শরিয়ত মত এ বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং লালমনিরহাট কাজী অফিসে রেজিষ্ট্রি হয় যার ক্রমিক নং ৬৪৪/৮৪ তাং ১৩.৯.৮৪, (নিকাহ বহি নং ১, ভল্যুম নং ৮/৮৪, পাতা ৪১) বিয়ের দেনমোহর ধার্য্য করা হয় ১৯,৫৯৯ টাকা যার মধ্যে ২৫০ টাকা

Nika book Ref

মাত্র তাৎক্ষনিকভাবে একটি সোনার নাকফুল বাবদ প্রদান করা হয় । বাকী ১৯,৩৪৯ টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য রেখে দেয়া হয় । এই রেজিষ্ট্রিতে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল । বিয়ের পর অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন এবং গোলাপীর ভগ্নিপতি খায়রুল ইসলাম আত্মতৃপ্তির সাথে বলেছিলেন যে, বিয়ের কাগজপত্র খুবই শক্তিশালী হয়েছে । কোনও যৌতুক দিতে হয় নাই । সেজন্যে কণে পক্ষ ছিল খুবই খুশী ।

কিন্তু দু:খের বিষয় বিয়ের কাগজপত্র টেকসই হলেও বিয়ে দীর্ঘদিন টিকেনি । কেন্তু কেন ? কেন মাত্র ৩/৪ বছরের মধ্যে তার সংসার জীবনের সমাপ্তি ঘটল ? কে এর জন্য দায়ী ? ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে গোলাপী রংপুর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে যে শপথনামা উচ্চারণ করে তার স্বামী আওয়ালকে তালাক দেয়, তা নিম্নরূপ :-

"আমি মোছা: গোলাপী , পিতা- আবদুল মতিন, সাং বাডডা, থানা সিংগাইর, জেলা- মানিকগঞ্জ. বয়স ২২ বৎসর, জাতী মুসলিম, পেশা - গৃহিনী. হাল সাং -ধাপ. উপজেলা- সদর কোতয়ালী. জেলা- রংপুর ।

প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিতেছি :-

১। আজ হইতে প্রায় ৩ বৎসর ৩ মাস পূর্বে মানিকগঞ্জ থানাধীন কৃষ্ণপুর উত্তরপাড়া সাকিনের বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলা নিবাসী মো: আবদুল হালিম মিয়ার পুত্র মো; আওয়াল এর সহিত আমার মুসলমান শরাশরীয়ত মোতাবেক রেজিষ্ট্রিকৃত নিকাহ হইয়াছিল ।

২। বিবাহ হইবার পর আমি আমার স্বামীর বাড়ী দুই বার মাত্র গিয়াছিলাম এবং তথায় অনুমানে দুই বারে ৩ মাস যাবৎ ঘর সংসার করিয়াছি । ঘর সংসার করাকালীন সময়ে জানিতে পারি যে, আমার স্বামী একজন চরিত্রহীন মদ্যপ ও দস্যু প্রকৃতির লোক ।

৩। প্রায় প্রায়ই আমার স্বামী চুরি ডাকাতি করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আমার হাতে বিভিন্ন ধরনের জিনিস পত্রাদি দিতে চাহিলে আমি নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় আমার উপর অকথ্য ভাষায় গালী গালাজ করিতো ।

৪। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে তাহার কুকর্ম হইতে ফিরাইতে পারি নাই। ৩ (তিন) মাস ঘর সংসার করার পর আমাকে মারডাং করিয়া তাহার বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয় ।

৫। অদ্যাবধি আমি আমার গরীব পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া কোন রকম হালে অনাহারে দিনাতিপাত করিতেছি । এই সুদীর্ঘ সময়ে আমার স্বামী আমার কোন প্রকার খোঁজ খবর করে নাই । কি কোন প্রকার ভরণ পোষণ দেয় নাই । আমি একজন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত মহিলা নিজের ভালমন্দ সব বুঝিতে সক্ষম হেতু স্বামীর সংগ প্রয়োজনে অত্র এ্যাফিডেভিট বলে নিজেকে স্বাধীন হিসাবে ঘোষণা করিলাম । আমি আমার স্বামীকে তালাক দিলাম । অদ্য হইতে আমি আমার পিতার বাড়ীতে স্বাধীন ভাবে বসবাস করিব ।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য জানিয়া স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র এফিডেভিট এ আমি আমার নিজ নাম সহি করিলাম ।

হলফ কারিনীকে আমি চিনি ও জানি,
আমার সম্মুখে তাহার নিজ নাম সহি/স্বাক্ষর
করিলাম ।

মোছা: গোলাপী বেগম
হলফকারিনীর সহি/স্বাক্ষর:
হলফকারিনী মি: মো: আবুল কালাম আজাদ
এ্যাডভোকেট সাহেবর সনাক্ত মতে উপরাক্ত
বিবরণ পেশ করিলাম ।

মো: আবুল কালাম আজাদ
৯.১.৮৮
সনাক্তকারী এ্যাডভোকেট,"

গোলাপী স্বেচ্ছায় তার স্বামীকে তালাক দেয় । ফলে তার দেনমোহরের ১৯,৩৪৯ টাকা মাত্র যা বিলম্বে প্রদানের শর্ত ছিল তা পাবার পথ বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কেন তার স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা দায়ের করেনি এ প্রশ্নের কোনও সুস্পষ্ট জবাব গোলাপী বা তার ভগ্নিপতির নিকট থেকে পাওয়া যায়নি । এফিডেভিট করার জন্য লালমনিরহাট থেকে রংপুর যাওয়ার প্রয়োজন কেন পড়ে, তারও সন্তোষজনক জবাব মিলেনি ।

গোলাপীর দাম্পত্য জীবনে কোনও সন্তানের জন্ম হয়নি । বিবাহ বিচ্ছেদের পর গোলাপী তার দুলাভাই খায়রুল ইসলামের সংসারে বাস করতে থাকে । এই পরিবারে যৌথভাবে গোলাপীর পিতাও তার সন্তানদেরকে নিয়ে বসবাস করছিলেন । সকলের আয় দ্বারা এ সংসারের ব্যয় নির্বাহ হতো ।

2nd m.

এরপর ১৯৯৩ সনে গোলাপীর দিবতীয় বিয়ে হয় । সবামীর নাম আবুল কালাম, বয়স অনুমান ৩৫ বছর, গ্রাম- কাঠিগ্রাম, জেলা - মানিকগন্জও । আবুল কালাম এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ । পেশায় প্রথমে ছিল বাসের সুপারভাইজার ও পরবর্তীতে বেকার । এই বিয়েও পারস্পরিক পরিচয়ের সূত্রে এবং দেশীয় ঘটকের উদ্যোগে ।

এই বিয়ের দলিলপত্রেও কোনও ফাঁক ফোকর রাখা হয়নি । সিংগাইর থানার বায়রা বাজার এম,এম,আর ও কাজী অফিসে নিকাহনামা রেজিষ্ট্রি করা হয় ২০.১২.৯৩ ইং তারিখে । দেনমোহর ধার্য করা হয় ২০,০০০ টাকা । নিকাহ অনুষ্ঠানের সময় দেনমোহরের কোনও অংশ পরিশোধ করা হয়নি । তবে সমুদয় অর্থ তলবান্তে প্রদেয় বলে উল্লেখ করা হয় । এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে দিকটি রয়েছে তা হচ্ছে নিকাহনামার ১৮ অনুচ্ছেদে সবামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দিয়েছে । যেখানে বর্ণিত রয়েছে সবামী নিরুদ্দেশ থাকলে, খোরপোষ না দিলে, পুরুষত্বহীন হলে বিবি মোছিকা যখন ইচ্ছা তালাক দিতে পারবে । স্ত্রীকে শরিয়তমতে পর্দাপুশিদায় রেখে ভরণপোষণ করার এবং ভদ্রোচিত খোরপোষের টাকা মাসে মাসে আদায়ের শর্ত নিকাহনামাতে লেখা ছিল ।

কিন্তু গোলাপীর ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগল না । বিয়ের পর একটি বছরও পেরোতে পারলনা । চুরমার হয়ে গেল তার সবপ্ন, তছনছ হয়ে গেলো তার সাধের সংসার । এ তো গোলাপী কল্পনাও করেনি, তার অভিভাবকরাও না । দাম্পত্য সুখের ভাগ্য গোলাপীর হলোনা, সংসারের সুযোগও তার হয়ে উঠলো না । বিয়ের আট মাসের মাথায় সে সবামীর সংসার থেকে বিচ্ছেন্ন হয়ে পড়লো । কিভাবে হলো তা তার দায়েরকৃত অভিযোগে উল্লিখিত আছে ।

বরাবর,
পরিচালক,
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড,
ঢাকা ।

দরখাস্ত কারিনী : মোসাম্মৎ গোলাপী বেগম
পিতা - মো: আ: জলিল
গ্রাম - বাড্ডা,
থানা - সিংগাইর
জেলা - মানিকগন্জও

প্রতিবাদী : আ: মান্নান মিয়া
পিতা - মো: কালু মিয়া
গ্রাম ও পো: কাটিগ্রাম
থানা ও জেলা :মানিকগন্জও

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, গত ২০.১২.৯৩ ইং তারিখে ২০,০০০/-(বিশ হাজার টাকা) দেন মোহর ধার্য্য করিয়া উক্ত প্রতিবাদীর সহিত আমার বিবাহ হয় । বিবাহের পর স্বামী, শশুর ও শ্বাশুড়ী ও দেবর কর্তৃক বিভিন্নভাবে সময়ে অসময়ে নির্যাতিত হইতে থাকি । স্বামীর চরিত্রে কিছু বদ অভ্যাস রহিয়াছে । প্রায় প্রতি রাতে মদ্যপান করিয়া গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে এবং আমাকে মারধর করে । বিবাহের সময় আমার পিতা ও আত্মীয় গণের পক্ষ হইতে ১৫,০০০/-(পনর হাজার টাকা) যৌতুক ১ ভরি ওজনের স্বর্ণের হার (৬,০০০/-) ছয় হাজার টাকা, ৪টি স্বর্ণের চুড়ী (২,০০০/-) দুই হাজার টাকা, জামা কাপড় বাবদ ২,০০০/- একটি সিকো ঘড়ি ১৮০০/- টাকা সর্বমোট ২৬,৮০০/- ও বিবাহের অন্যান্য খরচ বাবদ প্রায় ১২,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয় । বিবাহের ৩টি মাস পর আমার স্বামীকে বিদেশ পাঠাইবে বলিয়া আমার শশুর, আমার দুলাভাই এর নিকট হইতে ২৫,০০০/- টাকা ধার হিসাবে নিয়া যায় । পরবর্তী সময়ে উক্ত টাকা ফেরত চাইলে আমার দুলাভাই এর সহিত ঝগড়া হয় । সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বামী ও আমার শশুর আমার উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করে । গত মে ১৯৯৪ ইং মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাকে মারধর করে এবং বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয় । আমার স্বামী ও দেবর মো: রতন মিয়া জোর জবরদস্তীভাবে আমাকে বাড়ীর বাহির পর্যন্ত মারিতে মারিতে নিয়া যায় । যাহার পর আমি বাপের বাড়ীতে চলিয়া আসি । পুনরায় কয়েক বার মুরুব্বী সহযোগে স্বামীর বাড়ীতে যাই । কিন্তু স্বামী, শশুর শাশুড়ী ও দেবর, এরা সবাই মিলিয়া আমাকে তাড়াইয়া দেয় ।

গত ১৭.৭.৯৪ ইং তারিখে শেষ বারের মত স্বামী ও শ্বশুর কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আপনার দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করিতে মনস্থ করি। আমার স্বামী এ যাবৎ ৪টি বিবাহ করিয়াছে। আমার স্বামী, শ্বশুর ও দেবর বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সহিত জড়িত।

অতএব, হুজুর বাহাদুরের নিকট আকুল আবেদন এই যে, দয়া করিয়া উক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করত: সুবিচার করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

বিনীতা নিবেদিকা
আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

তবে গোলাপী আশা করে নারী নির্যাতন সেলে যে অভিযোগ দায়ের করেছে, তার যথার্থ বিচার সে পাবে, ন্যায্য হক ও অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে না। তার যে কাগজপত্র আছে, তাতে স্বামী আবুল কালাম ধরা পড়বেই, ছুটে যাবার কোনও পথ পাবে না। গোলাপী মামলার কাগজপত্র আরেকবার সযত্নে তার পুটুলিতে রাখে।

জাকিয়া

সকাল ১০.৩০ টা নারী নির্যাতন সেল এর দপ্তরে বেশ ক'জন মহিলা বসা, তাদের মধ্যে জাকিয়ার সাথে কথা হয় এবং পরিচয় হয়। ময়মনসিংহ জেলার: আব্দুল্লাপুর গ্রামের মরহুম শামীম সিকদারের এর কন্যা হচ্ছে এই জাকিয়া। জাকিয়ার স্বামীর নাম: শরফুদ্দিন, যার পিতা হচ্ছে ময়মনসিংহ জেলার শিরতা গ্রামের জনাব রহমতউল্লাহ। এ হচ্ছে জাকিয়া ও তার স্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

জাকিয়া ও শরফুদ্দিন এর বিয়ে হয় ১৯৯০ সনে। এ সময়ে জাকিয়ার বয়স ছিল ২৪ বৎসর। বর্তমানে শরফুদ্দিন গাজীপুরের টংগীতে অবস্থিত এরশাদ নগরের বাসিন্দা। তবে জাকিয়া সে পরিবার/সংসারে থাকছে না। কিন্তু কেন স্বামীর ঘরে থাকছে না জানতে চাইলে জাকিয়া বলে শরফুদ্দিনের সাথে ৩/৪ বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। এরপর ২/৩ বছর তারা একত্রে ভালভাবেই সংসার করতে থাকে। এ সময়ে তাদের একটি মেয়ে হয় যার বর্তমান বয়স দেড় বৎসর এবং নাম: রেশমা। মেয়ে বড় হওয়ার সাথে সাথে জাকিয়া ও তার স্বামীর মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হতে থাকে। একদিকে সংসারে ভরণ-পোষণের অভাব অন্যদিকে মদ খাবার নেসা এসব মিলিয়ে স্বামী শরফুদ্দিন প্রায়ই টাকা পয়সা চেয়ে জাকিয়াকে মারধর করতো। এ ধরনের ঝগড়া বিবাদ এর এক পর্যায়ে জাকিয়া তার মা'র কাছ থেকে ঋণ করে ৬০০০/- টাকা এনে দেয়। এরপরও শরফুদ্দিন জাকিয়াকে মারধর করতে থাকে। শরফুদ্দিন পুনরায় বিয়ে করার জন্যে জাকিয়াকে মারধর করে এবং ঘর ছেড়ে দেয় অর্থাৎ বিগত ৮/৯ মাস যাবত জাকিয়াকে তার স্বামী ঘরে রেখে ছেড়ে চলে যায়। এমতাবস্থায় তার স্বামী জাকিয়া ও তার সন্তানকে ভরণ-পোষণ ব্যয় দিত না। এ ঘটনার কিছু দিন পূর্বে বিবাদী ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে প্রতারণাপূর্বক জাকিয়ার টিপ সহি নেয় যাতে জাকিয়ার স্বাক্ষর রয়েছে, জাকিয়া তার স্বামীকে তালাক দিয়েছে একথাটি উল্লেখ রয়েছে এবং নগদ ৫০০/- টাকা মাত্র তার ছোট কন্যার জন্যে দেয়া হয়, তাও উল্লেখ করা হয়।

এমতাবস্থায় জাকিয়া তার স্বামী শরফুদ্দিনের অসৌজন্যমূলক ব্যবহার এবং তার কন্যার ভরণ-পোষণ না দেয়ার জন্যে বিচার চাইতে এসেছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন সেল-এ। কিন্তু কেন এমন আচরণ জনাব শরফুদ্দিন তার স্ত্রী-জাকিয়ার প্রতি করলো

তা জানতে চাইলে জাকিয়া বলে, শরফুদ্দিন প্রায়ই মদ খেত । এজন্যে তার মার কাছ থেকেও প্রয়োজনে অর্থ নিত । শুধুই কি তাই ? জাকিয়াকে তালাক দিয়ে শরফুদ্দিন তৃতীয় বিয়ে করে । নেশা করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ এবং জাকিয়াকে নিয়ে সংসার করার সময় ভরণ পোষণের অর্থ সে কোথায় পেত জানতে চাইলে জাকিয়া বলে, শরফুদ্দিন রড মিস্ত্রীর কাজ করতো । শিক্ষাগত যোগ্যতায় সে ছিল এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য একজন ।

এ অবস্থা চলতে থাকলে বিগত ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে । অর্থাৎ অবশেষে শরফুদ্দিনের সেই প্রতারণাপূর্বক ৫০ টাকার ষ্ট্যাম্পে তালাক প্রদানের চুক্তিটিই বাস্তবায়িত হয় । তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ০৫.০১.৯৪ তারিখ । এ বিষয়ে গ্রাম্য একটি সালিশ বসেছিল যেখানে গ্রামের আখতার মাতবর, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং জাকিয়ার আপন বড় ভাই, এরা সকলে মিলে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে । এরাই সে সালিশিতে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাতে করে জাকিয়া এবং শরফুদ্দিন উভয়ের মধ্যে কোনরূপে পুনর্মিলন না হয় ।

স্ত্রী জাকিয়াকে এভাবে তালাক প্রদানের পূর্বে ১৯৯৩ সালের আগষ্ট মাসে শরফুদ্দিন ঢাকার টংগীতে তার ভাড়া করা ঘরে রেখে চলে যায় আর কখনও ফিরে আসেনি- একত্রে ঘর করার লক্ষ্যে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় জাকিয়ার বিবাহের প্রক্রিয়া কিরূপ ছিল ? এ বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে করা হয়নি । মৌখিকভাবে সকলের উপস্থিতিতে ১০,০০০/- টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল । কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের পর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বলে, নারী নির্যাতন সেলে অধিকার আদায় করার জন্যে এ আবেদন করা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি । তাকে সবাই বলেছে যে, এ বিয়ের কাবিন/নিকাহনামা নেই বলে কোর্ট কাচারিতে তার মামলা সুবিধা করতে পারবে না । তাছাড়া জাকিয়া তার স্বামীকে তালাক দিয়েছে মর্মে যে ৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের দলিল, তা তার বিরুদ্ধে যাবে বলে আশংকা করছে । আইনের আশ্রয় নেয়া যায় এ ধরনের কোন জ্ঞানও তার ছিল না । স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়া যাবে কিনা জানতে গেলে গ্রামের মাতবর, স্বামীসহ অন্যান্যেরা ভয়ভীতি দেখাতে থাকে যে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হলে তার (জাকিয়ার) অসুবিধা হবে । এমনকি তার বাচ্চাকে নিয়ে যাবে । তাকে মেরে ফেলা হবে । এতসব হুমকি সত্তেও জাকিয়া থেমে

থাকেনি বরং সে তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন সেলে এসে আবেদন করে । আবেদনের ফলে এই সেল থেকে শুনানীতে উপস্থিত হবার জন্য জাকিয়ার স্বামীকে নোটিশ দেয়া হয় । এক পর্যায়ে শরফুদ্দিন নারী নির্যাতন সেল এর শুনানীতে উপস্থিত হয়ে আপোষনামায় স্বাক্ষর করে ।

নারী নির্যাতন সেলের আপোষনামায় স্বামী শরফুদ্দিন স্বীকার করেছে যে, জাকিয়া কে ইদ্দৎকালীন খোরপোষ বাবদ প্রতিমাসে ৫০০/- টাকা প্রদান করবে এবং এভাবে তিন মাস চলবে । বিবাহের কাবিন না থাকার কারণে বাদীর দেনমোহরের বিষয়ে কোন দাবী নেই । বিবাদীর ঔরষে একটি কন্যা সন্তান রয়েছে যার ভরণ-পোষণ বাবদ প্রতিমাসে ৩০০/- টাকা করে প্রদান করবে । এ সিদ্ধান্তের পর বিবাদী আর কোন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না বলে নারী নির্যাতন সেলের আপোষনামায় উল্লেখ রয়েছে । নারী নির্যাতন সেলে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং তারই আলোকে বিবাদীকে সেলে ডেকে এনে উপযুক্ত আপোষনামা/সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ।

নারী নির্যাতন সেলের আপোষনামা অনুযায়ী জাকিয়া ৬.৮.৯৪ তারিখে স্বাক্ষর প্রদান করে ইদ্দৎকালীন তিন কিস্তির সর্বশেষ কিস্তি বাবদ ৫০০/- টাকা এবং কন্যার জন্য ৩০০/- টাকা বিবাদীর নিকট থেকেও: গ্রহণ করে । এ অর্থ নিয়ে জাকিয়া তার পরিবারে ব্যয় করেছে । এর পাশাপাশি জাকিয়া তিনটি পরিবারে/ঘরে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে থাকে । এ উপার্জিত অর্থ দিয়ে তার সংসার/পরিবারের ভরণ-পোষণ করে থাকে ।

তালাকের পর কোথায় আশ্রয় নিয়েছে জানতে চাইলে জাকিয়া বলে বর্তমানে সে নিজে ও তার মা দুজনে মিলে অন্যের বাড়ীতে বাড়ীতে কাজ করে এবং হাউস পাড়ায় প্রযতে: আখতার সভাপতির বাড়ীতে ঘর ভাড়া করে একত্রে বসবাস করছে ।

তালাক প্রাপ্ত বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বিতাড়িত হবার পর জাকিয়া নিজেকে কোন দৃষ্টিতে দেখে-প্রসংগে জবাব দেয় যে, খুব একটা ভালনা । কারণ দু'টি বিয়ে করেও যখন সুখ-শান্তি হলো না তাই আর কোন বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং উচিৎও নয় । এখানে তার প্রথম বিয়ের ঘটনা বেরিয়ে আসে । অর্থাৎ শরফুদ্দিন ছিল তার দ্বিতীয় স্বামী ।

এবারে তাই প্রথম বিয়ের এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কথা জানা যেতে পারে : প্রথম স্বামীর নাম আখতার আহমেদ, যিনি সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ গ্রামের সন্তান । আখতার শিক্ষাগত যোগ্যতায় এসএসসি পাশ এবং বাবার রেশন দোকান দেখা-শুনা করতো । নিজে ছিল বেকার । জাকিয়া এবং আখতারের বিয়ে হয় বিগত ১৯৮৬ সনে এবং এ বিয়ের নিকাহনামা করা হয়েছিল অম্বিকাগঞ্জ কাজী অফিসের মাধ্যমে । তথাপি তাদের সংসার টিকেনি । সেখানেও জাকিয়ার ভাগ্যে জুটেছে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ । কেন জাকিয়াকে এমনভাবে বিতাড়িত হতে হয়েছে জানতে চাইলে সে বলে তার প্রথম স্বামী জনাব আখতার তাকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে । উল্লেখ্য যে, আখতার জাকিয়াকে নিজ ইচ্ছায় বিবাহ করেছিল - প্রবল ভালবাসা নিয়েই । জাকিয়ার ভাগ্যে সুখী সংসার করা আর হয়নি । অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় বিয়ে উভয়ই যেন জাকিয়ার দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে ।

সুফিয়া

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদের (২) দফায় স্পষ্টভাবে ঘোষনা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করবে । আসলে কি তা হচ্ছে ? যেমন একজন মুসলিম পুরুষ তার স্ত্রীকে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে শুধু একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তিনবার "তালাক" কথাটি বললেই হলো । কিন্তু একজন স্ত্রী তার স্বামীকে এভাবে তালাক দিতে পারে না । তবে কেন পুরুষ ও নারীর সমান অধিকারের কথা সংবিধানে ওভাবে বলা হয়েছে ? এ প্রশ্ন এখন শুধু সুফিয়ার একার নয় । অনেকে এখন এ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে ।

নারী নির্যাতন বন্ধ এবং নারীর সামাজিক অধিকারকে সুরক্ষার জন্যে দেশে বিভিন্ন আইন প্রচলিত রয়েছে । এ সব আইনের মধ্যে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১, নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ প্রধান । কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও কি নারীরা বঞ্চিত নিগৃহীত হচ্ছে না ? যেমনটি হয়েছে সুফিয়ার বেলায় । এবার তাহলে সুফিয়ার কাছ থেকেই শোনা যাক তার কথা ।

সুফিয়ার পিতার নাম : করিম মন্ডল, গ্রাম : চন্ডিপুর, ডাকঘর : নওগা, থানা : নওগা সদর, জেলা : নওগা । সুফিয়ার পিতা জনাব করিম মন্ডল পেশায় নওগা কোর্টের একজন মুহুরী । সুফিয়ার বর্তমান বয়স ৩৫ বছর । বিগত ১৯৭৯ সালে তার বাবার ইচ্ছা ও নির্দেশে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় একই গ্রামের ছেলের সাথে । এর পর তাদের সংসারে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান যার বর্তমান বয়স ১২ বছর । সুফিয়ার এ সংসার টিকেনি ।

সুফিয়ার বিয়ে হয়েছিল একটি বাইসাইকেল ও নগদ ৮০০০.০০ টাকা যৌতুক প্রদানের চুক্তির মাধ্যমে । কিন্তু কোন রেজিস্ট্রেশন হয়নি । বিয়ের পর সুফিয়ার বাবা শুধুমাত্র একটি সাইকেল দিতে পেরেছিল তার জামাইকে খুশী রাখার জন্যে । কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হয়নি জামাই বাবাজী । নগদ ৮০০০.০০ টাকা না দেয়ার ফলে স্বামী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় সুফিয়াকে । অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক স্ত্রী প্রহার । কিন্তু কেন এমন হলো সুফিয়ার সংসারে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ।

সুফিয়ার বিয়ের পর তার সংসারে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয় । ১৯৮২ সাল থেকেই তার স্বামী তাকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় একটি বিয়ে করে । এই বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হতে হয়েছে সুফিয়াকে মাত্র একটি কারণে - আর তা হচ্ছে প্রতিশ্রুত যৌতুকের একাংশ অর্থাৎ ৮,০০০ টাকা পরিশোধে তার পিতার ব্যর্থতা ।

শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম দিন থেকেই তার শাশুড়ী তাকে দেখতে পারতো না । অথচ উভয় পক্ষের মুরুব্বির ও আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বিয়ে হয়েছিল। সুফিয়ার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী যৌতুক ঠিকভাবে দিতে না পারা এবং স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা এ সব মিলে সুফিয়ার দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটায় । বিবাহ বিচ্ছেদও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়নি অর্থাৎ ঝুলন্ত একটা অবস্থা বর্তমানে চলছে; না সংসার না বিচ্ছেদ । মানসিকভাবেও সে এখন নিজেকে অন্যদের তুলনায় কিছুটা হীন মনে করে, কেননা যেমনটি সে চায়নি বা আকাঙখা করেনি তাই তার ভাগ্যে ঘটেছে । সমাজের দশজন তাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে, অথচ তার কোনও দোষ নেই ।

শাশুড়ীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও অপর যে ব্যক্তির ভূমিকা রয়েছে সে হচ্ছে সুফিয়ার সতীন । এই সতীন তার শাশুড়ীর সাথে সলা- পরামর্শ করে সবসময়ই সুফিয়ার সাথে ঝগড়া বিবাদ করতো এবং সুফিয়াকে তালাক দেয়ার জন্যে তার স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করতো । কাজেই স্পষ্ট বোঝা যায় সুফিয়া শ্বশুর বাড়ীতে তার শাশুড়ী ও সতীনের সাথে একত্রে সংসার করার পরিবেশ পায়নি ।

বিবাহ বিচ্ছেদের সমাধানের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, তা ছিল সাধারণ অর্থাৎ গণ্যমান্য ব্যক্তির শালিস । যেহেতু এ বিয়ে রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে হয়নি, সেহেতু এর কোন ডকুমেন্ট নেই, কোন আনুষ্ঠানিকতাও নেই, গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সুফিয়া তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে । কিন্তু সন্তান জন্ম লাভের পরে সুফিয়া তার শ্বশুর বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয় । এরপর আর তার স্বামী ফিরে আসেনি তাকে ঘরে তুলে নিতে । অর্থাৎ তাদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দূরত্ব । কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না কেউ ।

কিন্তু সুফিয়া এ বিষয়ে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেনি । কোন আইনের জ্ঞান বা অস্তিত্ব সম্পর্কেও তার জ্ঞান নেই বললেই চলে । তাছাড়া সে তার বাবার নিকট আইনের আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে বলে, আইনের আশ্রয় নেয়া মেয়েদের জন্য শোভনীয় নয় । কেননা এ বিষয়টি তাহলে সমাজে ছড়িয়ে পড়বে, জানাজানি হয়ে যাবে, যা হবে মেয়েদের জন্যে মান ইজ্জতের ব্যাপার । এছাড়া তার বাবার সে সামর্থ নেই যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে । তার বাবার মতে, মহিলাদের বিয়ে নিয়ে বেশী কেচাল (নওগাঁর ভাষায়) করা ভাল নয় ।

এ অবস্থায় সুফিয়া তার জীবিকা নির্বাহের জন্য উৎপাদন কর্মী হিসেবে থানা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে যোগদান করে । বর্তমানে কিভাবে তার সংসার চলছে জানতে চাইলে সে বলে, বাবার পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং সেখানেই বসবাস করছে । তার নওগাঁ থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তরে উৎপাদন কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে । সে মাসিক ৭০০/৮০০.০০ টাকা উপার্জন করছে । এর প্রায় অধিকাংশ অর্থই ব্যয়িত হয় তার বাবার সংসারে একত্র পারিবারিক ব্যয়ে ।

এ অবস্থায় পরিবারের ও সমাজের অন্যান্যরা তাকে কেমন চোখে দেখে এ বিষয়ে সুফিয়া বলে খুব একটা ভাল চোখে দেখে না, তবে যে দপ্তরে কাজ করছে সেখানে সকলেই মোটামুটি একত্রে কাজ কর্ম করছে; তারা কেউই খারাপ চোখে দেখে না ।

এখন তার উপার্জন ও সম্মান দেখে বেশ কয়েকবার দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব এসেছে । কিন্তু সুফিয়া কোন মতেই রাজী হয়নি । রাজী হয়নি তার নিজের মানসিক কারণে। সে ভাবে স্বামীকে ধরে রাখতে পারলনা এ বোধ হয় তার ব্যর্থতা, তার অক্ষমতা । আরেকবার বিয়ে হলে ঐ স্বামীকেও যদি ধরে রাখতে না পারে ? যদি তাকে ছেড়ে আর একটি বিয়ে করে বসে । সে জন্যেই নিজেকে সে অন্যের তুলনায় কিছুটা হীন মনে করে । তবে নিজ পরিবারে সদস্যদের কথা বলতে গিয়ে বলে, তারা সকলেই তাকে পরিবারের বড় মেয়ের মতই দেখে । যেমনটি দেখতো তার বিয়ের আগে - শৈশবে কৈশরে ।

কুলসুম

সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায় । বাড়ীর বাইরে আঙিনায় ৬/৭ জন দিন মজুর ধান মাড়াই এর কাজ করছে । প্রায় সকলের পরনে লুঙ্গি । শরীরে কোন জামা/গেন্জিও নেই, সবাই ঘামছে । এদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এ বাড়ীতেই কুলসুম অবস্থান করছে । কুলসুম বর্তমানে স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন । ১টি মেয়ে ও ১টি ছেলের জননী সে ।

কুলসুমের স্বামীর নাম: রহিম । পেশায় সে খেজুর রস বিক্রেতা এবং মাঝে মাঝে বর্গা চাষের কাজও করে থাকে ।

কুলসুমের বাবা মো: কবির । কুলসুমের বাবার বাড়ীর স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম: দুঘুচি, পোষ্ট অফিস: গোয়াল, ইউনিয়ন: গোয়াল, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া । বর্তমানে সে বেকার অর্থাৎ কোন কাজ করছে না । তাহলে প্রশ্ন আসে মো: কবির কিভাবে তার পরিবারের ব্যয় মিটায় ? মো: কবিরের কিছু জমি জমা ছিল যা কুলসুমকে বিয়ে দেয়ার পর বিক্রয় করে দেয় । এর পর থেকে তার সম্পত্তির ক্রেতা মো: হোসেন তার পারিবারিক ব্যয় মিটিয়ে দিচ্ছে । এ বিষয়টি পরিস্কার নয় তবে কুলসুমের বক্তব্য অনুযায়ী যা বোঝা যায় তা হচ্ছে মো: কবির তার জমির মূল্য নগদ অর্থে পায়নি আর তার পরিপূরক হিসেবে জমির ক্রেতাই প্রতি মাসের পারিবারিক ব্যয় মিটিয়ে থাকে । এ প্রক্রিয়া কতদিন পর্যন্ত চলবে তা কুলসুম বলতে পারেনি । কুলসুম স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে বাবার বাড়ীতেই অবস্থান করছে । তবে বর্তমানে অর্থাৎ এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার সময় অন্য বাড়ী তার বড় বোনের স্বামীর বাড়ীতে কিছু দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে এবং সেখানে অবস্থান করছে ।

কুলসুম বর্তমান বয়স ২৭ বছর । তার বিয়ে হয়েছিল ১৯৮৪ সালে । বর্তমানে একটি কন্যা ও একটি পুত্র আছে । কন্যার বয়স ৭ বছর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে এবং ২য়টি পুত্র যার বয়স সাড়ে চার বছর, ১ম শ্রেণীতে পড়ে । এতো গেল তার পরিবারের সদস্যদের পরিচয়ের কথা ।

কুলসুমের চেহারা এবং পোশাক দেখলে যে কেউ শিক্ষিতের ছাপ খুঁজে পাবে । সাক্ষাৎকারের দিন তার পড়নে ছিল একটি লাল রং এর ছাপার শাড়ী । গায়ের রং শ্যামলা ।

কেন কুলসুম স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, কেন তার বোনের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়েছে এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে সে তার জীবনের দু:খের কাহিনী একে একে তুলে ধরে ।

কুলসুম কাঁদো কাঁদো চোখে, বিষন্ন মুখে জানায় বিগত ১৯৮৪ সালে গ্রামের মোড়ল, মাতব্বর, বাবা-চাচা তথা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে একটি কাগজে স্বামী/স্ত্রী উভয়ের স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বিয়ে হয়েছিল । পরবর্তীতে শেরপুর থানার কাজী অফিসে এ বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করা হয় । যৌতুক ধার্য করা হয়েছিল ১১,৫০০.০০ টাকা । তার স্বামীর নিকট থেকে সে পেয়েছিল সোনার একটি নাক ফুল (দাম ১২৫.০০ টাকা তখনকারমূল্যে । এ ছাড়া অন্য কোনও গয়না তাকে দেয়া হয়নি । মো: কবির ১১,৫০০.০০ টাকা দিয়েছিল তার কন্যা কুলসুমের স্বামী মো: রহিমকে ব্যবসা করার লক্ষ্যে । বিবাহ বিচ্ছেদের পর যা ফেরত পাবার জন্যে কোনরূপ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি ।

প্রায় ১০ বছর সংসার করার পর কুলসুমের জীবনে স্বামী বলে কেউ থাকছে না । অর্থাৎ ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় । স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে কেন এ বিবাহ বিচ্ছেদ ?

কুলসুমের বক্তব্য অনুযায়ী তার বড় মেয়ে নাকি তার বাবাকে অর্থাৎ কুলসুমের স্বামী রহিমকে প্রায়ই বলতো "বাবার গা (শরীর) থেকে বাজে/খারাপ গন্ধ আসছে" । এর ফলে রহিম কুলসুমকে বলতো "ও তাহলে আমার সন্তান নয় অন্য কারো সন্তান হবে" । এ কথা নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতো । অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করতো এই ভেবে যে, স্ত্রী কুলসুম বোধ হয় অন্য কোন পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখে । এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে কলহ বিবাদ হতো প্রায়ই । এর পর স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে তিন তালাক কথাটি উচ্চারণ করা পর্যন্ত গড়িয়েছে । এমনকি দুবার স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র গমন করেছে কুলসুম।

এর সমাধানের জন্যে গ্রামের মোড়ল মাতবর, বাবা-চাচা তথা গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সালিশ বসেছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে এদের মধ্যে তালাক কার্যকর হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। আর এ তালাকের বিনিময়ে কুলসুম তার স্বামীর কাছ থেকে পাবে তিন মাস তের দিন ভরণ পোষণের ব্যয় বাবদ অর্থ। সেমতে কুলসুম তার স্বামীর নিকট থেকে ২২০০.০০ টাকা মাত্র পেয়েছে। যা তার বিবাহ বিচ্ছেদের পর সংসারে ব্যয় করেছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের আইন কানুন সম্পর্কে কুলসুম বলে সে একটি মাত্র আইন জানে আর তা হচ্ছে তালাকের পর স্বামী তার তালাক দেয়া স্ত্রীর তিন মাস তের দিন পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করবে।

কেন বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি প্রশ্নের জবাবে বলে, কেস চালাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং মহিলাদের জন্য এটি দুর্নামের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; তাই বাবার উপদেশ অনুযায়ী কোন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিবেশী এবং গ্রামের মোড়ল মাতব্বরগণও এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে।

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সে বলে যে নিজ উপার্জনে চলার জন্য সেলাই এর কাজ শিখছে এবং মাঝে মাঝে দু একটি সেলাই এর কাজ চুক্তিতে পেয়ে থাকে যার বিনিময়ে সে কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকে। বাবার বাড়ীতেই তার বর্তমান আশ্রয়। সে নিজে সংসারের খরচের একাংশ বহন করে, বাকী অংশ বহন করে তার বাবা। তার আশা, ভবিষ্যতে সে তার সংসারের খরচ নিজেই চালাতে পারবে - কারুর সাহায্য লাগবে না। তবে সংসার করার কথায় বলে আরেকটি বিয়ের কথা সে এ মুহূর্তে ভাবছে না।

রাহেলা

বিকেল ৪.০০ টা, সবাই কাজ করছে - বিভিন্ন রকম সেলাই এর কাজ । প্রায় ২০/২৫ জন মহিলা কর্মীর কাজ শেষ করে বিদায় নেয়ার পালা । এমন সময় ফরিদপুর জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে তার দপ্তরে দেখা হয় । তাঁর কাছ থেকে জানা গেল এই মহিলা কর্মীরা কয়েক ধরনের সেলাই এর কাজ করছে । এরা এ দপ্তরে সরকারী সহায়তায় সেলাই এর প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বিভিন্ন রকমের কাজ শিখছে । যেমন : শাড়ীতে কারুকাজ, ফলস লাগানো, জায়নামাজ, পেটিকোট, ব্লাউজ তৈরী প্রভৃতি ।

এত সব শুনে তাদের কাজ দেখার জন্যে দপ্তরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেল কেউ কম বয়সী, কেউ মাঝ বয়সী আবার কেউ চল্লিশোর্ধ মহিলা সবাই যার যার নির্দিষ্ট কাজে ব্যস্ত । এ কাজ করছে যারা তাদের মাঝে এমন একজন মহিলার সাথে পরিচয় ঘটে যার নাম রাহেলা । তার পিতার নাম : কাজেম চৌধুরী, গ্রাম : হাফেজডেঙ্গী, জেলা : ফরিদপুর ।

রাহেলা এ প্রশিক্ষণে কিভাবে এলো, কেন এলো এ কথা বলতে গিয়ে জানায় তার স্বামীর সাথে সংসার করা হয়নি । পরপর দু'বার তার বিয়ে হয়েছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে সংসার গড়ার । কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে । সবশেষে বাবার আশ্রয়ে এসে এখন সে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে ।

রাহেলা তার জীবনের দু:খের কাহিনী বলে যায় । তার প্রথম বিয়ে হয় যখন তার বয়স মাত্র ১২ বছর । এ সংসারে একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে । কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি যে, সে স্বামী এবং সন্তান কেউই জীবিত নেই । এরপর পুনরায় তার সংসার বাঁধার ইচ্ছা জাগলে ১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় বিবাহ হয় । এ স্বামীর নাম : আজাদ মোল্লা তার পিতার নাম ইসমাইল মোল্লা, গ্রাম : ধুতরার হাট, ডাকঘর : রসুলপুর, থানা : নগরকান্দা, জেলা : ফরিদপুর । এ হচ্ছে রাহেলার শ্বশুর বাড়ীর পরিচয় । তার স্বামী পেশায় কৃষিকাজ করে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ করেছে মাত্র । এ ঘরে সন্তান হয়নি । এ সংসারটিও টিকেনি বেশী দিন । কিন্তু কেন এমন হয় ?

জবাবে রাহেলা বলে ১৯৮৫ সালে দিবতীয় বিবাহ হলেও মাত্র ৪ বছর সংসার করার পর ১৯৮৯ সালের পর থেকে তার সবামী আজাদ মোল্লা তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় অর্থাৎ দু'জনের একত্রে সংসার করা আর হয়নি । ফলে সে তার বাবার বাড়ীতে চলে আসে ।

রাহেলা এ ধরনের বিচ্ছেদ এর কথা বলতে গিয়ে বলে যে, আজাদ মোল্লা তাকে বিবাহ করার ৩/৪ বছর পর থেকেই তার প্রতি সবামী সুলভ আচরণ করা থেকে বিরত ছিল এবং প্রায়ই আরেকটি বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করতো । আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আজাদ মোল্লার পূর্বে আরেকটি বিবাহ ছিল এবং এরপর দিবতীয় স্ত্রী হিসেবে রাহেলাকে ঘরে তুলে নেয় অর্থাৎ রাহেলা তার সতীনের সাথেই ঘর করতো । এভাবে ঘর-সংসার ৩/৪ বছর চলে । শুরু হলো তাদের পরিবারে অসন্তোষ । কারণ আজাদ মোল্লার প্রথম ঘরের সন্তান এবং তার ভাই এই রাহেলাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি । কাজেই তারা সকলে মিলে রাহেলাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো । এক কথায় প্রথম ঘরের সন্তানরা রাহেলাকে তাদের মা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি । সংসারে অসন্তোষ দেখে আজাদ মোল্লা নিজেই রাহেলার জীবন থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে চলে যেতে লাগলো । এভাবেই রাহেলার দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছে । উল্লেখ্য যে, এই ৩/৪ বছর আজাদ মোল্লার সাথে ঘর-সংসার করলেও তার ঔরসে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি ।

রাহেলা তাই এ সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে তার বড় ভাই, বড় চাচা, বাবা তথা গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সিদধান্ত নেয়ার জন্য অনুরোধ করে । তাঁরা সকলে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে রাহেলাকে আজাদ মোল্লার সংসার ছেড়ে পৃথক থাকার জন্য অনুরোধ করে। এরপর থেকেই রাহেলা তার সবামীর কাছ থেকে পৃথকভাবে জীবন যাপন করছে বাবার বাড়ীতে। যেহেতু এ বিবাহটি কোন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ঘটেনি, সেহেতু বড় ভাই, বড় চাচা সহ অন্যান্যরা কোনরূপ আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্যে পরামর্শ দেয়নি বরং সংসার ত্যাগের পরামর্শ দেয় । অথচ বিয়েতে রাহেলার বড় ভাই, বড় চাচাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল । এমনকি বিয়ের সময় মৌখিকভাবে ২৫০০.০০ টাকা দেনমোহরের কথাও বলা হয়েছিল কিন্তু এ বিয়ে রেজিস্টার্ড নয় বিধায় কোন আইনগত ব্যবস্হার মাধ্যমে রাহেলার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি । ফলে সে তার সবামীর কাছ থেকে দেনমোহরের ধার্যকৃত ২৫০০.০০ টাকা গ্রহণ করতে পারেনি। সবাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে ১ম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই কি আজাদ

মোল্লা রাহেলাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। সে কারণেই কি তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হয়নি। আর সে জন্যেই গ্রামের চেয়ারম্যান, বড় ভাই, বড় চাচা সহ সকলেই আইনের আশ্রয় নিতে নিষেধ করেছিল।

কেন এমন হলো জানতে চাইলে রাহেলা বলে সে বিয়ে সংক্রান্ত এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনের কোন অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে না। কেউ তাকে এ ধরনের আইনের কথা বলেওনি। তবে আইনের কথা জানলে সে বর্তমানের তুলনায় সচেতন হতো বলে জানায়। আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার পথে কেউ কখনও কোন বাধা বা ভয়ভীতি বা সামাজিক চাপের সৃষ্টি করেছিল কিনা জানতে চাইলে রাহেলা বলে, স্থানীয় চেয়ারম্যান আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয়ার পক্ষে অভিমত প্রদান করে। কেননা বিবাহটি আইনানুগ ছিল না এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা রাহেলার নিজের বা তার বাবার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করাই ভাল।

স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় রাহেলার নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তার জবাবে রাহেলা বলে হ্যাঁ, সে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাপড় সেলাই এর কাজ শিখছে অর্থাৎ বর্তমানে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর সে (রাহেলা) তার বাবার বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সকলেই তাকে ভাল চোখে দেখে, খারাপ চোখে দেখে না। পরিবার থেকে বা সমাজ থেকে পুনরায় বিয়ের জন্যে কোন জোর দেয়া হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে রাহেলা বলে না তেমন কোন জোর দেয়া হচ্ছে না।

যেহেতু বয়স মাত্র ৩০ বছর, সেহেতু অন্য কোন পুরুষ দ্বারা যৌন নির্যাতন/প্রলোভনের শিকার হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে রাহেলা বলে, না তেমন কোন নির্যাতন/প্রলোভনের শিকার হচ্ছে না।

সবশেষে রাহেলা বলে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সে তার বাবার পরিবারেই হোক বা নিজ পরিবারেই হোক স্বাবলম্বী হবে বলে আশা প্রকাশ করছে। ফলে স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নিজেকে আর নির্ভর করে থাকতে হবে না। সে লক্ষ্যেই সে সেলাই শিখছে গুরুত্ব দিয়ে।

পুষ্প বেগম

দিনটি ছিল শনিবার তারিখ ০৭-০৫-৯৪ । আনুমানিক বিকেল ৫:৪৫ টায় পুষ্পর কর্মস্হলে যেতে হয় । উদ্দেশ্য বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। সে সময়ে তিনি তার কর্মস্হলে কাজ করছিলেন । তার কর্মস্হল হলো একজন গৃহকর্তার বাড়ী এবং কাজ হলো ধান ঝাড়াই/ মাড়াই । হঠাৎ করে অপরিচিত একজন পুরুষকে দেখে তার সাথে কাজ করছিলেন এমন ক'জন চমকে যান । কেননা সে সময়ে সেখানে অপরিচিত কোন শহুরে পুরুষের উপস্হিতি তাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না । অবশ্য অল্পক্ষনের মধ্যেই একটি সহজ ও আন্তরিক পরিবেশে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায় ।

সাক্ষাৎকারগ্রহনকারী তার পরিচয় পান এভাবে - নাম: পুষ্প বেগম পিতা: পল্লান মিয়া, ডাকঘর: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ইউনিয়ন: ২ নং গাড়িদহ, থানা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া । তাঁর বাবার পেশা কৃষিকাজ । আর শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বললেই চলে, নাম সবাক্ষর করতে জানেন মাত্র । পুষ্পর বয়স তার বর্ণনানুযায়ী ২০-২১ বছর হয়তো । তার সন্তান একজন মেয়ে, বয়স দু'বছর, নাম সাবিনা । সে তার মায়ের পাশেই খেলা করছিল । ধুলোবালি মাখা খালি পা । পুষ্পর জমির পরিমাণ এক বিঘার মত প্রায়, ঘর রয়েছে ২টি, গোয়াল ঘর আছে একটি এবং গরু আছে ১টি । তবে তিনি বলেন তার নিজের নামে কোন সম্পত্তি নেই ।

বর্তমানে পুষ্প দিন মজুর হিসেবে কাজ করে দৈনিক ১০.০০ টাকা হারে মাসে ২৫০.০০ থেকে ৩০০.০০ নগদ টাকা উপার্জন করে থাকে । এছাড়া তার কর্মস্হলে অন্যান্য যা উপার্জন হিসেবে পাচ্ছে তা হচ্ছে দিনের তিন বেলার আহার/খাবার ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো তার এ অবস্হা কি সব সময়ই বিরাজমান ছিল ? জবাবে বলা যায়, না । কেননা তার ১৯৮৮ সালে বিয়ে হয়েছিল একজন পুরুষের সাথে শেরপুর কাজী অফিসে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে, যার নাম জানতে চাইলে বলেননি । কেননা বিবাহ

বিচ্ছেদের পরে তাদের গ্রামের প্রথানুযায়ী স্বামীর নামটি আর কারুর নিকট থেকে জানা যায়নি । নাম মুখে উচ্চারণ করা যায় না । তবে স্বামীর পেশা জানতে চাইলে বলেন, তিনি কৃষিকাজ করেন । তার গ্রামের বাড়ী কুতুবপুর এই থানারই অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামে । প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল কোন বছরে ? ১৯৯২ সালে, যখন তার সন্তানের বয়স মাত্র ৩/৪ মাস ।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধান কারণ স্বামী তাকে ও তাদের সন্তানকে ভরণ-পোষণ করতে পারেনি, তাই । এর মূল কারণ স্বামী শারীরিকভাবে অসুস্থ (টিবি অসুখে আক্রান্ত) তাই কাজ কর্ম করতে পারছে না । অপর কারণটি স্বামী মাঝে মাঝে স্ত্রী (পুষ্প) কে শারীরিক নির্যাতন/প্রহার করতো ।

বিয়ের প্রক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন তার বাবা, চাচা, স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বার সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । কাগজে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বিয়ে হয় । যা পরবর্তীতে শেরপুর কাজী অফিসে রেজিস্ট্রি করা হয় বলে জানা গেছে । এ পর্যায়ে যৌতুক হিসেবে স্বামীকে ২০০০.০০ টাকা দেয়ার কথা ছিল পুষ্পের বাবার ।

কিন্তু এ বিবাহ স্বামীর অসুস্থতা, বেকার থাকার কারণে টিকেনি যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । তবে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া হিসেবে বলেন, গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি, চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ এটি নিয়ে কয়েকবার সভায় মিলিত হন । কিন্তু কোন ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়নি । কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীকে তার ভরণ-পোষণের তিন মাস তের দিন পর্যন্ত খাবার খরচ, বাবদ ২০০০-৩০০০.০০ টাকা দিতে হবে, যা কিনা ঐ সময়ে স্বামী কর্তৃক প্রদান করা সম্ভব হতো না; কারণ স্বামী অসুস্থ বলে কোনরূপ উপার্জন করতে পারছে না । তাই মূলত: এ পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীকে (পুষ্প) কে তালাক দিতে চায়নি । এভাবে ২/৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত (বিবাহ বিচ্ছেদ) হয় সর্বশেষ সভায় । এ সিদ্ধান্ত একটি কাগজে কলমে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে ।

এক পর্যায়ে পুষ্প বিবাহ সংক্রান্ত বা বিবাহ বিচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট একটি মাত্র আইন জানেন বলে উল্লেখ করেন । আর তা হচ্ছে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তিন মাস তের দিনের সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণ খরচ দিতে হবে ।

তিনি ভরণ-পোষণের সমুদয় অর্থ স্বামীর নিকট থেকে পাননি । এর জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে বলেন, না । এর পিছনে যে কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে মহিলা হিসেবে কারো কোর্ট-কাচারী করা শোভনীয় নয়, পাড়াপ্রতিবেশী ও মাতব্বরগণ তা পছন্দ করেন না । কোর্টে গেলে তারা রেগে যেতে পারে তাছাড়া আইনের মাধ্যমে কেইস করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা পুষ্পের নেই, তার বাবার নেই । কাজেই তিনি কোন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেননি । এ ব্যাপারে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে তার বাবা, চাচা ও অন্যান্যরা ।

গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক তালাক প্রাপ্তির পর তিনি আজ অবধি তার বাবার বাড়ীতেই অবস্থান করছেন ।

দ্বিতীয় বিয়ের জন্য জোর করা হচ্ছে কিনা - প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেকেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু তিনি রাজী হননি । তবে শেষ জবাব দেয়নি । পরবর্তীতে হলেও হতে পারে ।

তালাক প্রাপ্তির পর পর কিছু দিন যৌন প্রলোভনের স্বীকার হয়েছিলেন কিছু ব্যক্তির দ্বারা । বিচ্ছেদের পর গ্রামের অনেকেই বলতো পুনরায় বিয়ে করার জন্য, কেউ কেউ তার সাথে এসে কথা বলতে চেষ্টা করতো প্রভৃতি । কিন্তু বর্তমানে সে ধরনের সমস্যা নেই ।

তার এই সাক্ষাৎকারের সময় মাঝে মাঝে তিনি কর্মস্থলের কাজও করেছিলেন ।

সখিনা

ঠিক যেন গ্রামের চিত্র খুঁজে পাওয়া গেল । সকাল ১১.৩০ মি: একটি বড় বাড়ীর উঠোনে ৫/৬ জন ধান ভাঙ্গার/ছাড়ানোর কাজ করছে এবং তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ, অন্যান্যরা মহিলা । শুধু তাই নয় ধান ছাড়ানোর এ কাজে দু'টি গরু সহায়তা করছে তাদেরকে । এ কর্মজীবী ৫/৬ জনের মধ্যে সখিনা একজন মহিলা কর্মী । সখিনার বর্তমান বয়স আনুমানিক ৩৭ বছর । সখিনা যে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছে, তাতে সে একটি চিঠি লিখতে পারে অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছে মাত্র ।

সখিনার পিতার নাম : মরহুম শরিফউদ্দিন পরামানিক । সে সাংসারিক কাজ কর্ম করতো এবং পেশা ছিলো তার কৃষিকাজ । স্থায়ী ঠিকানায় সখিনার জবাব ছিল একই অর্থাৎ বর্তমানে বাংরা, পো: আরডিএ (একাডেমী), থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া ।

সখিনার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে । তার বাবার মৃত্যুর পর তার মামা যিনি পেশায় স্কুল শিক্ষক সখিনার বিবাহের আয়োজন করেন । বিবাহের পর সখিনার গর্ভে দু'টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে । দু'টি কন্যা সন্তানের মধ্যে একটি মৃত্যু বরণ করে, অপরটির বর্তমান বয়স প্রায় ৯ বছর হবে । সখিনার একমাত্র সন্তান তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে ।

সখিনা তার স্বামী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে তার নাম মো: আব্দুল লতিফ মোল্লা, যার পেশা ব্যবসা । জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লার পিতার পরিচয়, নাম মোহাম্মদ মিহির মোল্লা, গ্রামের বাড়ী চকপাতালীয়া, ডাকঘর : একাডেমী, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া । এ হচ্ছে সখিনার পিতার এবং তার শ্বশুর বাড়ীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সখিনা বর্তমানে এ ধরনের ধান ছাড়ানোর কাজ কেন করছে ? জবাবে সখিনা বলে, তার একাজ ছাড়া অন্য কি কাজ করার আছে । কেননা সে তৃতীয় শ্রেণী পাশ অন্য দিকে স্বামী পরিত্যক্তা । তাছাড়া তার থাকার জায়গাও নেই । এ সকল দিক মিলিয়ে সে মনে করে যা করছে তাই একটা উপায় মাত্র । সখিনা ধান মাড়ানো/ঝাড়ার কাজ

করছে এবং এর পাশাপাশি হাঁস মুরগী পশু পালনও করে থাকে । এভাবেই সে মাসে ৪০০/৫০০ টাকা উপার্জন করে থাকে ।

তার সংসার চলছে বাংরা মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পাধীন এলাকায় । সখিনার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ১৯৮২ সালে । কিন্তু কেন এ বিচ্ছেদ ? কেনই বা তাকে দৈনিক মজুরের কাজ করতে হচ্ছে ? এ প্রশ্ন আজ সকলের । জবাবে সখিনা বলে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে জনাব মো: আবদুল লতিফ মোল্লার সাথে । কিন্তু সে কোনরূপ ভরণ-পোষণ করতে পারতো না । শুধু তাই নয় যৌতুক চেয়েছিল ৪০০০.০০/৫০০০.০০ টাকা যা' পরবর্তীতে সখিনা তার স্বামীকে দিতে পারেনি । এছাড়া তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছাও তাকে পেয়ে বসেছে । অর্থাৎ একদিকে সখিনাকে ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার মেটাতে পারছে না, অন্যদিকে তার দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা তাকে সখিনা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । এতো গেল সখিনার জীবনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা ।

অন্যদিকে সখিনার স্বামী সখিনাকে তার যৌতুকের চাহিদা মোতাবেক অর্থ না দেয়ার জন্যে শারীরিক/দৈহিক নির্যাতন করতো । সহজ কথায় সখিনাকে শারীরিকভাবেই প্রহার/নির্যাতন করতো ।

আবার পারিবারিক জীবনও সখিনার ভাল যেত না শ্বশুরালয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে অসামঞ্জস্যতার কারণে । স্বামী আবদুল লতিফ মোল্লা তার নিজের ইচ্ছায় সখিনাকে বিয়ে করেছিল ঠিকই কিন্তু তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে পারেনি । জনাব আবদুল লতিফ মোল্লার মা তার সন্তানের স্ত্রী সখিনাকে সহজভাবে পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি ।

স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন জাগে তাহলে সখিনার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল কি প্রক্রিয়ায় ? হ্যাঁ, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী সখিনাকে লিখিত তালাক প্রদান চিঠির মাধ্যমে ঘটেছিল । সেক্ষেত্রে সখিনা অবশ্য এ চিঠির বিপরীতে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা চেয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো । কিন্তু তা করেনি । নিজের গরজ/ইচ্ছা কম ছিল ।

বিবাহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সখিনা বলে স্বামী কর্তৃক যৌতুক চাওয়ার মাধ্যমে এ বিবাহ হয়েছিল। এ বিবাহে সখিনার নিকট যৌতুক চাওয়া হয়েছিল ৪০০০.০০ টাকা এবং কিছু সোনার অলংকার যা সখিনার পক্ষে দেয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। তথাপিও সখিনার বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য তার স্বামীকে সখিনার মা কর্তৃক দেয়া হয় প্রায় ২০০০.০০ টাকা এবং কিছু স্বর্ণের অলংকার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সখিনা ও মোঃ আবদুল লতিফ মোল্লার মধ্যে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। অর্থাৎ কোন কাগজপত্র হয়নি। এমনকি কাজী অফিসে রেজিষ্ট্রেশনও হয়নি।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রাপ্য দেনমোহরের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সখিনা বলে কোন অর্থই তার স্বামীর নিকট থেকে সে ফেরত পায়নি। অন্যদিকে তার বিবাহের সময় কোন দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে বলে, না। অর্থাৎ যেহেতু কাজী অফিসে কোন রেজিষ্ট্রি হয়নি সেহেতু এর কোন দেনমোহর ধার্য করা হয়নি। অধিকন্তু সখিনাকে ৪০০০/৫০০০.০০ টাকার যৌতুক এর জন্য স্বামী পরিত্যক্তা হতে হয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সখিনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কতটুকু জানে। জবাবে বলে যে, আইনের মাধ্যমে স্বামীকে শাস্তি প্রদান করা যায় এবং দেন মোহর আদায় করা যায় এটুকুই জানে। কিন্তু কেন তার নিজের ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় (আইনানুগ ব্যবস্থা) নেয়া হয়নি? জানতে চাইলে সখিনা বলে তার মামা বলেছে মেয়ে (সখিনাকে) নিয়ে আইনের মাধ্যমে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেনা। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নাকি এটি ঠিক নয়। একথা কেন বলা হয়েছে জানতে চাইলে সখিনা বলে তার মামা একজন হাজী মানুষ তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর তার নিজের জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সখিনা তার পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ে যায় অর্থাৎ সে বলে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প বাংরা'এ তার স্থান সংকুলান করে নিয়েছে এবং ধান উঠার সময় এবং অন্যান্য কৃষিকাজে দৈনিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করে নিজের জীবন চালাতে পারছে। সে তার জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে দিন মজুরীকেই

বেছে নিয়েছে । এছাড়া অন্য যে উপায় নির্বাচন করেছে তা হচ্ছে একটি ছাগল কিনেছে যা থেকে প্রতি বছর বাচ্চা এবং বিক্রয়ের জন্য দুধ পাচ্ছে । এর পাশাপাশি কিছু মুরগী লালন পালন করছে যা থেকে সে কিছু ডিম পাচ্ছে, মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন করছে এবং তা বাজারে বিক্রয় করেও অর্থ উপার্জন করছে ।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর সামাজিকভাবে সখিনা কেমন জীবন যাপন করছে জানতে চাইলে বলে, সে একাডেমীর উদভাবিত বাংরা প্রকল্পে ভাল সামাজিক পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছে । কেননা এ পরিবেশে তার মত আর কয়েকজন রয়েছে যারা গরীব ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং তারা নিজেরাই নিজের জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে । সে কারণেই অন্য কোন সদস্য মহিলা/পুরুষ "সখিনা খারাপ" এরূপ কোন উক্তি বা কোন নিন্দা করছে না, যা অন্য কোন স্থানে অবস্থান করলে সখিনাকে হয়তো শুনতে হতো । দ্বিতীয় বিবাহের কোন ব্যবস্থা/জোর করা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে বলে হ্যাঁ, অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু সখিনা 'না' বলে সকলকেই বিদায় করে দিয়েছে ।

মানসিক/শারীরিক ভাবে সখিনা নিজেকে কেমন চোখে দেখে জানতে চাইলে বলে, কিছুটা খারাপ লাগে । যখন অন্যান্য মহিলাকে স্বামীর সাথে একত্রে ঘর সংসার করতে দেখে, নিজেকে তখন কিছুটা হীন মনে হয় অন্যানের তুলনায় । বিবাহের প্রস্তাব ছাড়া যৌন নির্যাতন/প্রলোভনের স্বীকার হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে বলে, না, তেমন কোন সমস্যা হয়নি । তবে মাঝে মাঝে অনেকেই দ্বিতীয় বিবাহের জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করে ।

পারিবারিকভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কেমন চোখে দেখে জানতে চাইলে সখিনা বলে, তারা মোটামুটি ভাল চোখেই দেখে । তারা মেনে নিয়েছে সখিনার সামাজিক, পারিবারিক ও বৈবাহিক অবস্থাকে । কেননা তার নিজের কোন দোষ ত্রুটি খুঁজে পায়নি তারা । যা হয়েছে তা অনিবার্যভাবেই তার স্বামী জনাব আবদুল লতিফ মোল্লার জন্যেই হয়েছে বলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে । কাজেই সবশেষে সখিনা বলে, সে যা করছে তা খারাপ নয় বরং নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পেয়েছে এবং সেভাবেই নিজের একটি মাত্র সন্তানকে নিয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে ।

মালতি

থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর, নওগাঁ । এ দপ্তরের একটি ঘরের ভেতরে কাজ করছে প্রায় ২০/২৫ জন মহিলা । প্রশ্ন জাগে তারা কি কাজ করছে ? হ্যাঁ তারা বিভিন্ন রকম সেলাই এর কাজ শিখছে । এদের মধ্যে যুবতী থেকে মধ্য বয়সী মহিলারাও আছে । এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের সেলাই, যেমন : জায়নামাজ প্রস্তুত করা, সোফার কভার তৈরী করা, শাড়ীতে কারুকাজ ও ফল্স লাগানো প্রভৃতি । যারা এখানে কাজ করছে তাদেরই একজন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে যার নাম মালতি ।

মালতির পিতার নাম মো: আবদুল জব্বার, পেশায় একজন স্কুল দপ্তরী, নওগাঁ শহরের একটি হাই স্কুলের । স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম : জগৎ সিংহপুর, পো: নওগাঁ, থানা: সদর, জেলা: নওগাঁ । মালতির বয়স মাত্র ২০ বছর হবে । পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে ।

মালতি তার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে বলে, তার বিয়ে হয় বিগত ১৯৯১ সালে । কোন সন্তান হয়নি তার সংসারে । তার স্বামীর নাম মোহাম্মদ হাতেম, পিতার নাম মরহুম আলাউদ্দীন, স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম: বলিরঘাট, ডাকঘর: নওগা, থানা: সদর, জেলা: নওগাঁ । মালতির স্বামী পেশায় দর্জী । শিক্ষাগত যোগ্যতায় সে এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ফেল করেছে ।

মালতি বর্তমানে নওগাঁ থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তরে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে । বিনিময়ে পাচ্ছে সে প্রতি মাসে ৯০.০০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক ৩.০০ টাকা এবং এর সাথে প্রতি মাসে ৩১.২৫ কেজি গম । হয়তো এ ধরনের উপার্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না যদি না সে বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হতো । তার ঘর না ভাঙলে, কপাল না পুড়লে, সে ঘরের বার হতো না যতই কষ্ট হোকনা কেন । কামাই রোজগারের কথা চিন্তাতেই আসতো না ।

বর্তমানে মালতি তার বাবার বাড়ীতে অবস্থান করছে । এ পরিবারে ২ বোন ১ ভাই এবং বাবা মা মিলে মোট পাঁচ জন সদস্য একত্রে বসবাস করছে । মালতির উপার্জনের

সমুদয় অর্থ এবং গম এ সংসারে ব্যয় করে থাকে । এর সাথে তার বাবার মাসিক ১০০০.০০ টাকা যোগ হয় । এভাবে একত্রে সাংসারিক ব্যয় কোনভাবে মিটে যায় ।

১৯৯১ সালে বিয়ে হলেও তাদের সংসার টিকেনি । মাত্র আড়াই মাস একত্রে ঘর করার পর ১৯৯২ সালে তাদের মধ্যে আর কোন মিল হয়নি । কিন্তু কেন এমন হলো ? মালতি বলে তার স্বামীর সাথে এ বিয়েতে তার কোন মত ছিলনা । কিন্তু তার বাবা তাদের সংসারের ব্যয় মেটাতে পারেনা বলে জোর করেই মালতির এ বিয়ে দেয়া হয় -তার স্বামী হাতেমের সাথে । মালতির এ বিয়ে হয়েছিল যৌতুক ধার্য করার মাধ্যমে । গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ তার বাবা মা, চাচা চাচী তথা অন্যান্যরা সকলে মিলে এই যৌতুক ধার্য করেছিল ১২,০০০.০০ টাকা । কিন্তু সরকার যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ করেছে এবং এটি অনুসরণ না করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আইন জারী করেছে । যদিও তার বাবার সামর্থ ছিলনা, তবুও তার মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভেবে, জামাইয়ের আর্থিক সচ্ছলতা আসবে একথা বিবেচনা করে ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা দিয়েছিল । বাকী ৭,০০০.০০ টাকা দিতে পারেনি । ভেবেছিল, ভবিষ্যতে সুযোগমত এ টাকার ব্যবস্থাও করবে । এই টাকা পায়নি বলেই মালতিকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি বিয়ে করেছে হাতেম এবং এখন ঐ নতুন সংসার করছে । ঐ বিয়েতে হাতেম শ্বশুর বাড়ী থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকার যৌতুক পায় ।

মালতিকে আরও কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে । স্বামী হাতেম মালতিকে প্রায়ই শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো তার যৌতুকের সমুদয় অর্থ এনে দেয়ার জন্যে । এর পাশাপাশি হাতেম তার স্ত্রী মালতিকে সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করতে বলতো । কিন্তু কোন কোন সময় মালতিকে এতটা শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো যা সে সহ্য করতে পারতো না, ফলে মালতি বাবার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেয় ।

একদিকে স্বামীর নির্যাতন, অন্যদিকে তার শ্বশুর বাড়ীর অন্যতম সদস্য শাশুড়ীর সাথে অমিল ও মনোমালিন্য, এসব মিলে মানসিকভাবে সে নিজেকে হীন মনে করতে লাগলো । ফলে বাবার বাড়ীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে ।

এ অবস্থা দূর করতে মালতি তার বাবাকে গ্রাম্য সালিশ এর প্রস্তাব দেয় । এ সালিশে যে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে, সে' হচ্ছে গ্রামের মোড়ল-মাতবর । এরা গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি, এরা প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বেঁচে থাকে । এ মোড়ল মাতবরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মালতিকে তার বাবার ঘরেই ফিরে যেতে হয়েছে । তারা আরও পরামর্শ দিয়েছে যে, যেহেতু মালতির বিয়ে কোন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে হয়নি সেহেতু তারা কোন আইনের আশ্রয়ও গ্রহণ করতে পারবে না । তার বাবার দেয়া ৫,০০০ পাঁচ হাজার টাকার যৌতুক উদ্ধার করার ব্যাপারে মাতব্বরগণ কিছুই করেনি । দ্বিতীয় বিয়ে করার অভিযোগ করলে মাতব্বরগণ মৃদু হেসে নাকি বলেছিল যে, পুরুষ মানুষ দ্বিতীয় বিয়ে করবে, তাতে অবাক হওয়ার কি আছে ?

মালতি তবু তার স্বামীর বাড়ীতে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তার শাশুড়ী ও সতিন শলাপরামর্শ করে হাতেমকে ক্ষেপিয়ে তোলে । এক সময়ে হাতেম মালতিকে জোর করে তার বাড়ী থেকে বের করে দেয় । মালতি ভয় পেয়েছিল, ওখানে থাকলে যদি তারা তাকে খুন করে ফেলে ?

মালতি জানায় যে, ঐ সময় কেউ তাকে বলেনি যে যৌতুক ও দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়ে আইন তার পক্ষে । সে মাত্র সেদিন তার অফিসের বড় আপার কাছে এই আইনের কথা জানতে পেরেছে । আগে সে সেলাইয়ের কাজটা ভাল করে শিখে নিবে । তারপর মেশিন কিনবে । হাতে কিছুটা টাকা এলেই সে কোর্টে যাবে, হাতেমের দ্বিতীয় বিয়ের বিচার আর তার বাবার দেয়া যৌতুকের টাকা সে উদ্ধার করবেই । তার চোখে মুখে ফুটে উঠে দৃঢ়তার ছাপ ।

রহিমা - তার দুর্ভোগ, সংগ্রাম ও স্বপ্ন

ঢাকা সাটুরিয়া পাকা সড়কের উপর ধামরাই থানার কালামপুর একটি নামকরা বাজার, গরুর হাটের জন্য বিখ্যাত। বাজারের কিছু দূর পরেই বাটুলিয়া বুৎসাহাটি রাস্তা। মাঝে বংশাই নদী। খেয়া পার হতে কয়েক মিনিট লাগে। তারপর গাঁয়ের আঁকা বাকা পথ - দুপাশে বসতবাড়ি, বাঁশঝাড়, ফসলের মাঠ। বুৎসাহাটির দিকে আনুমানিক এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর বাম পাশে চোখে পড়ে দেওনিয়া গ্রামের পাকা মসজিদ। মসজিদের উত্তরে দুটো বাড়ী পরেই উঁচু ভিটিতে কয়েকটি বসতবাড়ী। তারই একটি ঘরে বাস করে রহিমা।

রহিমাকে গ্রামের সকলেই চিনে। কোদাল ও ঝুড়ি হাতে আরও চারজন মেয়ের সংগে পাঁচ জনের একটি দল সারা বছর গ্রামের রাস্তায় কাজ করে - এ দৃশ্য গ্রামবাসীরা গত ১০ বছর নিত্যদিন দেখে আসছে। গতর খেটে সংসার চালায় এ গ্রামের যে ক'জন মেয়ে, রহিমা তাদের একজন। দু ছেলের ও নিজের পেট চালানোর জন্য সারা বছর কাজ করতে হয়। তবু তার কপাল ভাল, চাকরিটা পেয়েছে। দীর্ঘ দিনের একটানা পরিশ্রমে আজ নিজেকে অনেকটা ক্লান্ত মনে হয়; কিন্তু আত্মবিশ্বাসের ভিত বেশ মজবুত হয়েছে - নিশ্চিত একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন তার মনে উঁকি দেয়। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়, একটি দুধেল গরু ও ছোট একটি মুদির দোকান। সংসারে থাকবে সে আর তার দুই নয়নের মনি - ধলা ও আক্কাস। এই স্বপ্নের পাশাপাশি তার দু চোখ ক্রোধে ফেটে পড়ে - মনের গহীন থেকে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসে - না, আর নয়, আর কোনও পুরুষ স্বামী হয়ে তার জীবনে আসবেনা।

আরও দশটি মেয়ের মত রহিমার স্বপ্ন ছিল সুখের সংসার গড়ার। ছোট বেলায় মা বাবা মারা যায়। তার চাচা করিমউদ্দিন তাকে লালন পালন করেন। ১৬/১৭ বছর আগে পাশের গ্রামের মাহবুবের সংগে রহিমার বিয়ে হয়। মাহবুব পেশায় ছিল দিন মজুর। বাড়ীতে নিজস্ব একটি থাকার ঘর ছাড়া আর কোনও সহায় সম্পত্তি ছিলনা। রহিমার বিয়েতে দেনমোহর ধার্য করা হয় সাত হাজার টাকা, বিয়ে রেজিষ্ট্রি করা হয়। গয়না দিয়েছিল,

রূপার চুড়ি ও গলার মালা । অভাব অভিযোগ থাকলেও কষ্টেসৃষ্টে তাদের সংসার চলে যাচ্ছিল : বিয়ের দু বছরের মাথায় তার প্রথম ছেলে ধলার জন্ম হয় । তার স্বামী মাঝে মাঝে পাশের গ্রামে রাত কাটাত । জিজ্ঞেস করলে কিছু বলত না । রহিমার শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর তার সংগে বরাবর ভাল ব্যবহার করত । বিয়ের ছয় মাস পর তার স্বামী মাহবুব অনেকটা জোর করে তার রূপার চুড়ি ও গলার মালা বিক্রি করে দেয় এই বলে যে, পরে সুদিন আসলে গয়না আবার গড়ে দিবে । কিন্তু সেই সুদিন তার জীবনে আর আসেনি ।

কিছু দিনের মধ্যে আরেকটি বিয়ে করার জন্য সে জিদ করতে থাকে । রহিমা তাকে অনেক বুঝায়, তার আয় নেই, ছেলে বৌ এর খরচ চালাতে পারে না, আরেক বৌয়ের খরচ কিভাবে আসবে । স্বামীর সাথে রাগ করে, অভিমান করে, ঝগড়া হয় । স্বামী তাকে মাঝে মাঝে মারধোর করতে থাকে, প্রথমে কম কম, পরে নিয়মিত । শ্বশুর-শাশুড়ী তার স্বামীকে এজন্য বকাঝকা করত । এর মধ্যে রহিমার কোলে আসে তার দ্বিতীয় সন্তান আক্কাস । ঐ সময়ই হঠাৎ শোনা যায় যে রহিমার স্বামী মাহবুব পাশের গ্রামে আরেকটি বিয়ে করেছে এবং শ্বশুর বাড়ীতে ঘর জামাই হিসেবে থাকছে । ঘরে খাবার নেই, বাচ্চা হওয়ায় রহিমা নড়াচড়া করতে পারে না - এই অবস্থায় তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে চলে গেল । তার শ্বশুর ছিল খুবই গরীব । গ্রামের মাতব্বরগণ চাঁদা তুলে তার এক মাসের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে ।

শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ গ্রামের লোকজন মাহবুবকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং উপায় না পেয়ে মারধরও করে । কিন্তু তবু মাহবুব ফিরে আসেনি রহিমার সংসারে । দ্বিতীয় ছেলেটিকে চোখের দেখাও দেখেনি । রহিমা বলে "আমার ও বাচ্চাদের জন্য তার মায়া মমতা আসে নাই, মন গলে নাই" । এরপর গ্রামের মাতব্বর ও পাড়াপ্রতিবেশীরা ব্যর্থ হয়ে রহিমাকে তার ব্যবস্থা নিজেকেই নিতে বলে । সিদ্ধান্ত হয় যে, সে তার চাচার সংসারে ফিরে আসবে । একটি ৪ বছরের আর একটি এক মাসের বাচ্চা কোলে নিয়ে স্বামী পরিত্যক্তা রহিমা যখন পিতার দুই শতাংশ জমির ভিটায় ফিরে আসে তখন তার বুক ভাঙা, চোখ ভরা পানি । বর্তমান তার কাছে অনিশ্চিত এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার । তার চাচা করিমউদ্দিন তখন জীবিত । তিনি মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করতেন । রহিমা বলে, তিনজন মানুষকে খাওয়ানো চাচার পক্ষে সম্ভব ছিলনা ।

অধিকার আদায়ের জন্য আইনের আশ্রয় কেন নেয় নাই জিজ্ঞেস করলে রহিমা জানায় যে, সে লেখাপড়া জানে না, গরীব মানুষ, বাবা নেই, বড় ভাই নেই - কোর্ট কাচারি চিনে না, কোর্টের খরচই বা কে দিবে আর তদবিরই বা কে করবে ? তাছাড়া যে মানুষটা তাকে ও তার অসহায় সন্তানদেরকে এভাবে ফেলে চলে গেল, তাকে শারীরিক নির্যাতন করলো, তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেই বা কি হবে ? আর যার নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, শ্বশুর বাড়ীতে ঘর জামাই হয়ে আছে - তার কি মুরোদ আছে তার কাবিনের টাকা ফেরত দেবার, তার ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করার ? এর বেশী সে চিন্তা করেনি এবং কেউ তাকে এই ব্যাপারে কোনও পরামর্শ দেয়নি বলে সে জানায় ।

তারপর আরম্ভ হয় রহিমার সংগ্রামী জীবন । প্রথমে পরের বাড়ীতে ঝি গিরি করে সংসারের খরচ চালাতে চেষ্টা করত । কখনো কখনো উপোস থাকতে হতো, কখনো খাবার জুটত। এই সময় দশ বছর আগে, তার চাচা ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারকে ধরে তাকে আর,এম,পি কর্মসূচীতে গ্রামের রাস্তা মেরামতের কাজ জুটিয়ে দেয় । অকূল সাগরে সে যেন পেল কূলের সন্ধান । তারপর থেকে সে এই কর্মসূচীর কর্মী হিসেবে কাজ করছে এবং এটার দ্বারাই দু:খে কষ্টে তার সংসার চালাচ্ছে ।

তাকে সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করতে হয় । তাদের তিন নম্বর ওয়ার্ডের CARE এর রাস্তায় । সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত রাস্তার ছোটখাট গর্ত, ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙা অংশ মাটি কেটে মানুষ ও গাড়ী চলার জন্য ঠিক রাখতে হয় । প্রথম যখন কাজ শুরু করে তখন দৈনিক ১২ টাকা হিসাবে মজুরী পেত, আজ তা বেড়ে দৈনিক ২৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে । তারমধ্যে ২৩ টাকা নগদ প্রায় চৌদ্দদিন পর পর কালামপুর সোনালী ব্যাংক থেকে । বাকী দৈনিক ৫ টাকা হারে তার নামে ব্যাংকে জমা হয় । মেম্বার, চেয়ারম্যান, থানার অফিসাররা মাঝে মাঝে আসেন, তবে মাসে একবার না জানিয়ে কেয়ারের অফিসাররা আসেন । তারা খুব কড়া, কাজে না পেলে মজুরী কেটে দেয় । তাই ভয় হয় যদি চাকরিটা চলে যায়; সেজন্য কেউ দেখুক না দেখুক সে কাজ করে যায় । এই কাজ চলে গেলে আবার বাড়ী বাড়ী ঝিয়ের কাজ করা ছাড়া উপায় থাকবেনা । রোদে, বৃষ্টিতে সারা বছর অনেক কষ্ট হয়, রাতে শরীর ব্যথা করে, একদিন রাস্তায় কাজ করার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল।

তিনদিন কাজে যেতে পারেনি । অন্য বদলা পাঠিয়ে ছুটি নিয়েছিল । দুবার জরিমানা দিতে হয়েছিল । অনেক সময় মানুষে টিটকারী দেয় - বলে যে, মেয়েগুলো কাজ করার চেয়ে ফাঁকি দেয় বেশী । কেউ ইজ্জত নষ্ট করার সাহস পায়নি, খারাপ কাজের ইঙ্গিতও করেনি । রহিমা বলে - "নিজে ভালা থাকলে দুনিয়া ভালা । কেউ কিচ্ছু করতে পারেনা" ।

রহিমার বড় ছেলের বয়স ১৪/১৫ - বাড়ন্ত গড়ন, বদলা কাজ করতে শুরু করেছে । ছোটটা ব্র্যাকের স্কুলে পড়ে - তৃতীয় শ্রেণীতে । সে প্রশিকা সমিতির সদস্য - এক হাজার টাকা জমিয়েছে । একচালা টিনের ঘর উঠিয়েছে । ব্যাংকে তার যে টাকা আরএমপি কর্মসূচীতে জমেছে তা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে । এখনো তার হিসাবের টাকা ব্যাংক থেকে তোলা যায় না । তবে সে শুনেছে আগামী বছর তাদেরকে ট্রেনিং দিবে । তারপর ইচ্ছা অনুযায়ী টাকা উঠিয়ে কাজে লাগাতে পারবে । সেও তাই চায় । একটানা মাটি কাটার কাজ আর ভাল লাগে না । তার ইচ্ছা টাকাটা উঠাতে পারলে আগে ঘরখানা নতুন করে উঠাবে - বড় চৌচালা । তারপর একটি গরু বা কয়েকটি ছাগল কিনবে ও লালন পালন করবে আর বাকী টাকা দিয়ে ছোট একটি মুদির দোকান দিবে - সে আর তার বড় ছেলে ধলা পরিশ্রম করে দোকানটা ভালভাবেই চালাতে পারবে বলে তার বিশ্বাস । আক্কাস পড়াশোনা করে মানুষ হবে, বড় হবে - তার মায়ের দুঃখ ঘুচাবে । রহিমা বলে, ছেলেরা বাপের কথা শুনতে পারে না, আমিই তাদের মা-বাপ । অনেকদিন পর তার স্বামী নাকি তাকে নিতে এসেছিল । সে রাজী হয়নি, মুরুব্বীরাও না । ছোট বাচ্চাদের মানুষ করার জন্যই সে আর বিয়ের কথা ভাবে নাই । এখন সে চায় সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ, যেখানে সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে সুখে সম্মানে বেঁচে থাকবে ।

ঘটনা-সমীক্ষার বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ হল নারী । আর সে নারীর অধিকাংশই হচ্ছে দরিদ্র, অশিক্ষিত - যাদের অধিকাংশ বাস করে গ্রামে। এরাই অতীতে নানাভাবে হয়েছে বঞ্চিত, নিগৃহীত ও নির্যাতিত, আর তাই তারা সমাজে রয়েছে পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে । এ কারণেই বাংলাদেশ সরকারের চতুর্থ পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম সাধারণ কৌশল হচ্ছে নারী উন্নয়নকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা ।

কিন্তু এ প্রতিবেদনে উল্লিখিত যে কটি ছোট ছোট ঘটনা-সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে তা পাঠ করলে উপরের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সাথে কি কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় ? অর্থাৎ উল্লিখিত পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা কি এ ঘটনা-সমীক্ষায় নারীদেরকে চিন্তা করে করা হয়েছিল ? কেননা সামষ্টিক পরিকল্পনায় দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের স্বার্থ বিবেচনা করার কথা । যদি সঠিকভাবে বিবেচনা করা হতো তাহলে ময়মনসিংহ জেলার জাকিয়া, ফরিদপুর জেলার রাহেলা নওগাঁ জেলার সুফিয়া কিম্বা ধামরাই থানার রহিমা এরা বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হয়ে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে এভাবে বঞ্চিত, নিগৃহীত ও নির্যাতিত হতো না ।

অথচ বিবাহ বিচ্ছেদকে সরলরৈখিক বা একমাত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করার অবকাশ নেই । আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা সমবলিত অসংখ্য চলক ও আন্ত:সম্পদের যে জটিল অবস্থান নিয়ে আমাদের জীবন, তার সঠিক পটভূমিতে একে বিশ্লেষন করতে হবে । যে কটা ঘটনা সমীক্ষা নিয়ে আমাদের গবেষণা কাজটি পরিচালিত হয়েছে, সেগুলোতেও এই বহুমাত্রিক প্রভাব বিদ্যমান । তবে সবগুলো ঘটনায় বিভিন্ন চলক ও আন্ত:সম্পর্কের প্রভাব একরূপ নয় । কোনটাতে সামাজিক কারণ বেশী শক্তিশালী, আবার মনস্তাত্ত্বিক উপাদান কোন কোন ঘটনা সমীক্ষায় বেশ ক্রিয়াশীল । বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সামাজিক নেতৃত্বের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভূমিকা লক্ষ্যণীয় । অনেক সময় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনটি হয়তো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে আত্মীয়তার, স্বার্থের বা অন্যমাত্রায় ধনাত্বক/ঋণাত্বক সম্পর্কিত হতে পারে এবং সামাজিক নেতৃত্বের যে ভূমিকা, উদ্যোগ ও response বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে ।

সাধারণভাবে নারীদের স্বার্থ, অধিকার, মর্যাদার ব্যাপারে আমাদের সমাজের ভূমিকা দুর্বল ও নেতিবাচক। সমাজের বিদ্যমান বিশ্বাস, আচার, দৃষ্টিভংগী ইত্যাদি গরীব, দুর্বল ও মহিলাদের স্বার্থের পরিপন্থী। এটা যুগে যুগে বাংলার সামাজিক বিবর্তনে লক্ষ্যণীয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক জীবনে নারীর অবস্থান ছিল দুর্বল ও অসহায়। চর্যাপদসহ অন্যান্য সাহিত্যকর্মে এর প্রতিফলন ব্যাপক। আধুনিক যুগেও সাহিত্যে নারীর যে ছবি শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তাতে গ্রামীণ ও গরীব মেয়েদের নাজুক চিত্রটিই প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধা প্রসারের ফলে এবং পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও উদার দৃষ্টিভংগীর প্রভাবে আমাদের সমাজের আলোকপ্রাপ্ত ও বিত্তবান অংশের মধ্যেই মাত্র নারীর প্রতি অনুকূল মানসিকতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যেখানে অধিকাংশ লোক বাস করে এবং যেখানে দারিদ্র ও অশিক্ষা ব্যাপক, সেখানে নারীর প্রতি সনাতনী নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী এখনও বিরাজমান। এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে বিবাহ বিচ্ছেদে নারী শুধু হচ্ছে দুর্বল, অসহায় নাজুক (vulnerable) প্রকৃতির প্রাণী।

নারীদেরকে এ ধরনের বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার করতে, তাদের অধিকার আদায় করতে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। যেমন : নারীদের বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ রোধ করা এবং বিবাহ বিচ্ছেদে বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন মেনে তাদের মৌলিক অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১, ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯, ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে ঘটনা-সমীক্ষাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তা পাঠ করলে এমন কি কোন প্রভাব/প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় যা বগুড়া জেলার পুস্প, নওগাঁ জেলার মালতি কিম্বা বগুড়া জেলার কুলসুম এর ক্ষেত্রে ঘটেছে ?

গ্রামীণ সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক নিরোধ আইন থাকা সত্বেও যৌতুক ছাড়া বিবাহ হচ্ছেনা, হলেও তা টিকছেনা অর্থাৎ যৌতুক নিরোধ আইন মানা হচ্ছেনা। হলে নওগাঁ জেলার মালতি কিভাবে বিবাহ এবং তা থেকে বিচ্ছেদের শিকার হলো ? সেখানে সামাজিক চেতনা কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে ?

যখনই কোন নারী বিপদগ্রস্থ হয়েছে, যখনই সে বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হয়েছে, তখনই দোষ/দায়-দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে নারীর উপর। অর্থাৎ নারীর পক্ষে তখন আর কেউ থাকেনা বরং এর বিপরীত ঘটলে সামাজিক চাপ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো (Rural Power Structure) নারীর বিপক্ষে এসে দাঁড়ায়। কেননা নারীরা শিক্ষা, অর্থ, শারীরিক, সকল দিক দিয়েই পুরুষের তুলনায় দুর্বল। তা না হলে নওগাঁ জেলার মালতির এমন অবস্থা হতো না। কেননা দেখা গেছে বগুড়া জেলার ছমিরণের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে গ্রাম্য সালিশ বসেনি বরং গ্রাম্য মাতবর জনাব আইসনা'র কথাই সিদ্ধান্ত হিসেবে কার্যকরী হয়। এসব ক্ষেত্রে Female voice is not heard. নারীদেরকে এভাবে দুর্বল করা, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, নির্যাতিত করা কেবল এ যুগে নয় বরং এ অবস্থা প্রাচীন, মধ্যযুগে এবং বৃটিশ আমলেও ছিল আর তা উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তমানে এসে বর্তায়। তার আংগিক, পরিবেশ এবং Force Factors ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। এমনকি ময়মনসিংহ গীতিকাতেও আছে নারীরা কিভাবে পদে পদে বঞ্চিত হচ্ছে। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে প্রাচীনকালে মহিলাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে ও গৃহভৃত্য হিসেবে তথা দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো, এমনকি দুর্ভিক্ষের সময় নারীদেরকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করা হতো। শরৎচন্দ্রের "বিলাসী" গল্পেও বিলাসী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে নারীদের অবস্থান কোথায় তা নির্ণয় করা যায়। বর্তমানেও পতিতাবৃত্তি রয়েছে তবে পরিবেশ ও ধরনে কিছুটা আধুনিকতা যোগ হয়েছে মাত্র। অভাবের তাড়নায় নারী পাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্তমানে।

নারীদের অধিকার রক্ষায় যখন বেশ কিছু আইন কানুন রয়েছে ঠিক তখনই লক্ষ্য করা যায় অশিক্ষা, দরিদ্রতা এবং অসচেতনতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে প্রচলিত ধর্মীয় ও আইনগত অধিকার কতটুকু এবং কি, তা গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সবার জানা নেই যার প্রমাণ মিলে নওগাঁ জেলার সুফিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে। ফরিদপুর জেলার রাহেলাও এর বাইরে নয়। ময়মনসিংহ জেলার জাকিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর মৌলিক অধিকার আদায়ে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন সেল যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তা ফুটে উঠেছে।

বর্তমানে নারীদের অধিকার/মর্যাদা আদায়ের জন্য শিক্ষা সচেতনতা, বিবাহ করা সংক্রান্ত কিছু কিছু প্রচারণা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেমন : বাংলাদেশ

রেডিও এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে জনাব কুদ্দুস বয়াতির জারীগানের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ নিরোধ করা সম্পর্কে সতর্কবাণী থাকে। তবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, গণমাধ্যমসমূহ অন্যান্য কার্যক্রম যেভাবে গুরুত্বসহকারে প্রচারণা করে থাকে, নারীর অধিকার আদায়ের স্বপক্ষে সেভাবে জোরালোভাবে করছে না।

এসবের পরও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেননা প্রায় প্রতিটি নারী তার স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর থেকেই কোন না কোন ভাবে পারিবারিক তথা সংসারের বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজ করে থাকে যাকে আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়না। এছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমেও নারীরা অংশগ্রহণ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বেশ কিছুটা ভূমিকা পালন করছে। যেমন : দেশের বিভিন্ন জেলা/থানা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/দপ্তর-এ গৃহীত সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তার উজ্জ্বল প্রমাণ দেয়। ফরিদপুর জেলার রাহেলা কিভাবে তার জীবন চালাচ্ছে তাতেই এ উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তেমনি নওগাঁ থানা মহিলা বিষয়ক দপ্তরে গৃহীত একই প্রশিক্ষণে সুফিয়ার অংশগ্রহণ উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করছে তা দেখা যেতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্রই নারীরা পরিবারের বিভিন্ন কাজ যেমন: ধানভানা, হাঁস-মুরগী, পশুপালন প্রভৃতি করে থাকে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গৃহীত পরিকল্পনা, প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রভৃতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস-অনুভূতির সাথে কিছুটা হলেও ক্রিয়াশীল হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা, সমাজের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র নারীরা সকলে সরাসরি উপকৃত না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের উপকার হচ্ছে, যা এ ঘটনা সমীক্ষা/প্রতিবেদনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমন : রহিমা কিভাবে CARE এর RMP র কাজ করে জীবন যাপন তথা সংসার চালাচ্ছে? বগুড়া জেলার সখিনা কি প্রক্রিয়ায় RDA এর বাংরা ভূমিহীন মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পে নিজ বাড়ী/ঘর নির্মাণের সুযোগ পেল? বগুড়া জেলার পুষ্প কিভাবে তার সংসার চালাচ্ছে? বিশ্লেষণ করলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের নারীরা অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং এরা সুখী পরিবার গড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে, স্বামীর কাছ থেকে হয়েছে বঞ্চিত, নির্যাতিত। যার ফলে তাদেরকে বিবাহ

বিচ্ছেদের শিকার হয়ে ব্যক্তিক পর্যায়ে স্ব-উদ্যোগ প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তবে নারীর অভিভাবক তথা রক্ত-সম্পর্ক কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে সন্তানদের উপর কি কি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা সমীক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে, তবে এই ঘটনা সমীক্ষায় গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধির মধ্যে ইহা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেজন্য মূল আলোচনায় ও প্রতিবেদনে এর ওপর পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়নি। তবে ঘটনা সমীক্ষাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সন্তানদের উপর বিবাহ বিচ্ছেদ বিভিন্ন মাত্রায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন, সন্তানদের ভরণ পোষনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি সন্তানদের মনস্তাত্বিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে বলে আশংকা করা যায়। পিতার প্রতি সন্তানের নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী সৃষ্টিতেও বিবাহ বিচ্ছেদ দায়ী বলে মনে করা যায়। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পথে ভাংগা সংসারে মায়ের একক আয় ও স্নেহ যে অপ্রতুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে পৃথকভাবে ঘটনা সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় এবং সে ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অনেক তথ্য/ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ কম। তবে এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্যে ব্যাপক প্রচারণা এবং সচেতনতা কার্যক্রমটি বিবেচনায় আনা যায় কিনা, সেটিও খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

সুপারিশ : বর্তমান সমীক্ষাটি জীবনালেখ্যমূলক বিশ্লেষণধর্মী ঘটনা সমীক্ষা। প্রতিবেদনে ১০টি ঘটনা (Case) এর উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। মূলত এ ঘটনা সমীক্ষাটি প্রশিক্ষণ কোর্সের অধিবেশন সমূহে অনুশীলনের জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এ ঘটনা সমীক্ষা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সুপারিশ প্রণয়ন করবেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ফলাফল ও সুপারিশমালা বিতরণ না করাই ভাল, কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁদের স্বকীয় চিন্তার প্রবাহ ব্যাহত/প্রভাবিত হতে পারে। অবশ্য প্রশিক্ষক এগুলো নিরীক্ষা করতে পারেন এবং প্রত্যেক প্রশিক্ষণ অধিবেশন/অনুশীলনের পর নতুন নতুন বিষয়, উপাদান ও মাত্রা যোগ করতে পারেন এবং ক্রমাগতভাবে এই আপটুডেটিংয়ের মধ্যেই প্রশিক্ষণ উপাদান হিসাবে এর কার্যকারিতা সফল হতে পারে। গবেষকদের সুপারিশ নিম্নে বর্ণিত হলো :

১। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন সমূহ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করতে হবে। সেজন্য আইন মন্ত্রণালয় লিফলেট বা পুস্তিকা প্রণয়ন করে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে এবং গণমাধ্যম সমূহে (রেডিও, টিভি, খবরের কাগজ, প্রভৃতি) প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

২। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলনের ব্যবস্থা করতে পারে। এর পাশাপাশি নারী নির্যাতন সেল এ বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী প্রহৃত হলে, স্বামীকে সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক শাস্তি প্রদানের বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

৪। সংশ্লিষ্ট আইন সমূহে উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (চেয়ারম্যান, গ্রাম্য নেতা)কে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ববান হতে হবে এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৫। যে সকল কর্মকর্তা/বিচারকগণ বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিচারকার্যে নিযুক্ত আছেন তাদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত একটি বিশেষ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে বিপিএটিসি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬। সংশ্লিষ্ট আইনের কোন কোন ধারা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশোধন করা যেতে পারে, যাতে আইনসমূহ সময়োপযোগী ও প্রয়োগ যোগ্য হতে পারে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

৭। দেশের ব্যাপক অশিক্ষিত/আধা-শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রণোদনমূলক (Motivational) কার্যক্রম (সভা, সমিতি, সম্মেলন, নাটক প্রভৃতি) পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া নাট্য সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে।

৮। এ বিষয়ে দেশে কর্মরত এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থা ও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৯। দেশের আইনজীবি সমিতিগুলোকে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় তঁাদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আইনজীবিরা বিনা পারিশ্রমিক/সম্মানীতে দরিদ্র মহিলাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

বিচিত্রা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা। ঢাকা : ২২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৩ সেপ্টেম্বর '৯৩/ ১৯ ভাদ্র ১৪০০ সাল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (খসড়া) ১৯৯০-৯৫ :I-৪

সংশ্লিষ্ট আইন সমূহ :

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১
১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন
মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন (১৯৩৯)
১৯৪৭ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন
১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন

Mookerzee, Asuthosh, Marriage, Separation and Divorce. Calcutta : S.C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd, 1986.

Report of the Task Force on Bangladesh Development Strategies for the 1990's, Vol-I; Dhaka: 1990.

Todaro Michael P, Economic Development in the Third World (4th Ed.) New York & London : Longman, 1989.

UNICEF, বাংলাদেশের শিশু ও নারী। ঢাকা : জাতিসংঘ শিশু তহবিল, ১৯৯১।

Why Marriages Break Up (A study on Dirvorce in Rural Bangladesh), LWF/World Service, Bangladesh (RDRS, July, 1990).

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

(The Family Courts Ordinance, 1985)

(১৯৮৫ সালের ১৮নং অধ্যাদেশ)

পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলীর বিহিত ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত ;

সেইহেতু, এক্ষনে, ইং ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ঘোষণা এবংউহাতে বর্ণিত যাবতীয় ক্ষমতা অনুসারে প্রেসিডেন্ট নিম্ন-লিখিত অধ্যাদেশ জারি করিতেছেন ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, সীমা ও বলবতের সময় (Short Title, Extent and Commencement) : (১) এই অধ্যাদেশ ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য বান্দরবন এবং পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলাসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ ঃ (Definitions) : (১) বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গ হইতে বিপরীত কিছু প্রতীয়মান না হইলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) "কোষ" (Code) বলিতে দেওয়ানী কার্যবিধি কোষ, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নম্বর আইন)-কে বুঝাইবে ;

(খ) "পারিবারিক আদালত" বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আদালতকে বুঝাইবে।

পরিশিষ্ট

(গ) "নির্ধারিত" বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ;

(২) অত্র অধ্যাদেশে সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই এমন ব্যবহৃতশব্দ ও অভিব্যক্তি, দেওয়ানী কার্যবিধি কোষের অনুরূপ অর্থবহ হইবে ।

৩। অন্যান্য আইনের উপর অত্র অধ্যাদেশের প্রাধান্য (Ordinance to Override Other Laws) : প্রচলিত অপর কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, অত্র অধ্যাদেশে বর্ণিত বিধানসমূহই কার্যকরী হইবে।

৪। পারিবারিক আদালতসমূহের প্রতিষ্ঠা (Establishment of Family Courts) : ১) যতগুলি মুন্সেফী আদালত রহিয়াছে ততগুলি পারিবারিক আদালত থাকিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে সকল মুন্সেফী আদালত পারিবারিক আদালত হইবে।

(৩) সকল মুন্সেফ পারিবারিক আদালতের বিচারক হইবেন।

৫। পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার 'Jurisdiction of Family Courts) : পারিবারিক আদালতসমূহের, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন (১৯৬১ সালের ৮ নম্বর আইন)-এর ব্যবস্থা সাপেক্ষে, নিম্নলিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত বা তৎউদ্ভূত সমস্ত বা যে কোন বিষয়ে মামলা গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তি করার অনন্য এখ্তিয়ার (exclusive jurisdiction) থাকিবে ঃ

(ক) বিবাহ-বিচ্ছেদ ;

(খ) দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার ;

(গ) দেনমোহর ;

(ঘ) ভরন পোষণ ;

(ঙ) সন্তানদিগের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত।

টীকা ঃ নিম্নলিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত বা তৎউদ্ভূত সমস্ত বা যে কোন মামলা ঃ ইহাতে অত্র ধারার (ক) হইতে

ধারা ৫ হেফাজতের অধিকারী কোন আত্মীয় বা আগন্তক অপেক্ষা উক্ত নাবালকের মায়ের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতাটি অধিক নহে।" নাবালকের পক্ষে মা, ভাই, চাচা বা অন্য যে কোন আত্মীয় কর্তৃক নাবালকের সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক অথবা অন্য যে কোন হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে অবৈধ (33)।

মায়ের প্রতিনিধিত্বে বাটোয়ারা দলিল ঃ কার্যতঃ অভিভাবক হিসাবে মায়ের প্রতিনিধিত্বে সৃষ্ট নাবালকের কোন বাটোয়ারা দলিল নাবালকের পক্ষে মাতার সম্পাদন অবৈধ হইবে এবং উহাতে নাবালক বাধ্য হইবে না। কোন অবস্থাতেই নাবালকের কার্যতঃ অভিভাবক নাবালকের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না এবং উহা অনুমোদনেও সিদ্ধ হয় না। [('52)P. Pesh. I ; ('50) P. Pesh. 69 ; ('54) A. Tra. Coch. 370].

অভিভাবক কর্তৃক নাবালকের পক্ষে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি ঃ নাবালকের অভিভাবক নাবালকের পক্ষে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি করিলে, উহা নাবালক কিংবা তাহার সম্পত্তিকে বাধ্য করিবেনা। এই জাতীয় চুক্তি অবৈধ (34)।

['ক' নাবালক 'খ'-এর ভূ-সম্পত্তির ম্যানেজার। তিনি 'খ'-এর পক্ষে 'গ'-এর নিকট হইতে কিছু স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে চুক্তি করিলেন। চুক্তিটি অবৈধ এবং 'খ' অথবা 'গ' কেহই চুক্তিটি প্রবলের জন্য কোন মামলা দায়ের করিতে পারিবে না।]

আইনানুগ অভিভাবকের অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ঃ নাবালকের সম্পত্তির আইনানুগ অভিভাবক, নাবালকের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে নাবালকের জিনিসপত্র ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে কিংবা বন্ধক দিতে পারেন (35)।

আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবকের অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা ঃ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবক উক্ত নাবালকের অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ

34. Mir Sarwarjan v Fakhruddin (1912) 39 I A 1, 39 Cal, 232, 13 I C 331
35 P L D 1901 (W P) Lah 888,

৬। **মোকদ্দমা রুজু করন (Insitution of suits)ঃ**

১) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রত্যেক মোকদ্দমা আর্জি দাখিল পূর্বক স্থানীয় অধিক্ষেত্র সম্পন্ন সেই পারিবারিক আদালতে রুজু করিতে হইবে যাহার এখতিয়ারাধীনে—

ক) নালিশের কারণ পুরাপুরি বা আংশিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, অথবা

খ) পক্ষসমূহ যেখানে বসবাস করেন বা সর্বশেষ একত্রে বসবাস করিয়াছিলেন ; শর্ত এই যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেন মোহর অথবা খোরপোষ সম্পর্কিত মোকদ্দমায় স্ত্রী সাধারণতঃ যেখানে বসবাস করেন সেই এলাকার অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালতেরও এখতিয়ার থাকিবে।

২) এখতিয়ারবিহীন কোন আদালতে আর্জি দাখিল করা হইলে—

ক) আর্জিটি যে আদালতে দাখিল করা উচিৎ ছিল উক্ত আদালতে দাখিল করণার্থে ফেরত দেওয়া হইবে ;

খ) আদালত আর্জিটি ফেরৎদানকালে আর্জিটি উক্ত আদালতে দাখিলের ও ফেরতের তারিখ, দাখিলকারীর নাম, ফেরতের কারণ ইত্যাদি আর্জির উপর লিখিয়া দিবেন।

৩) আর্জিতে বিরোধ সম্পর্কিত সকল অত্যাবশ্যক তথ্যাবলী উল্লেখিত হইবে এবং আর্জির সমর্থনে যে সকল স্বাক্ষী হাজির করা হইবে উহাদের নাম ও ঠিকানাসমূহ এবং অনুরূপ স্বাক্ষীগণ যে বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবেন উহার সার সংক্ষেপ বিবৃত করিয়া একটি তফশীল আর্জির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ঃ

শর্ত এই যে, বাদী আদালতের অনুমতিক্রমে মোকদ্দমার পরবর্তী যে কোন পর্যায়ে যে কোন সাক্ষী ডাকিতে পারেন যদি আদালত ন্যায় বিচারের খাতিরে অনুরূপ সাক্ষ্যগ্রহণ সমীচীন মনে করেন।

৪) আর্জিতে নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ থাকিতে হইবে; যথা ঃ-

ক) যে আদালতে মোকদ্দমা রুজু করা হইল উহার নাম ;

খ) বাদীর নাম বর্ণনা ও বাসস্থানের বিবরণ ;

গ) বিবাদীর নাম বর্ণনা ও বাসস্থানের বিবরণ ;

ঘ) বাদী বা বিবাদী নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ হইলে তদ্বিষয়ে বর্ণনা ;

ঙ) নালিশের কারণ উদ্ভুত হওয়ার তথ্যাবলী, উহা উদ্ভবের স্থান ও তারিখ ;

চ) আদালতের এখতিয়ার আছে প্রদর্শন করিয়া তথ্যাবলী ;

ছ) বাদীর দাবিকৃত প্রতিকার ;

৫) কোন বাদীর দাবীর সমর্থনে প্রমাণ তাহার দখলে বা আয়ত্তাধীনে কোন দলিলের উপর নির্ভরশীল হইলে, আর্জি দাখিলের সময় তিনি উক্ত দলিল আদালতে পেশ করিবেন এবং একই সঙ্গে উক্ত দলিল বা উহার অবিকল বা ফটো নকল আর্জির সহিত নথীভুক্তির জন্য দাখিল করিবেন।

৬) স্বীয় দখলে বা আয়ত্তাধীন নহে, বাদীর দাবীর প্রমাণ এমন কোন দলিলের উপর নির্ভরশীল হইলে, তিনি উক্ত দলিলটি একটি তালিকাভুক্তি করতঃ আর্জির সহিত সংযোজনার্থে উল্লেখ করিবেন এবং উহা কাহার দখলাধীন বা আয়ত্তাধীন রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করিবেন।

৭) বিবাদীগণের উপর জারীকরণার্থে, বিবাদীগণের সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক তফশীল সহ আর্জির অবিকল নকল এবং (৫) নং উপধারায় উল্লেখিত দলিল সমূহের অবিকল নকল এবং (৬) নং উপধারায় উল্লেখিত দলিল সমূহের নকল আর্জিসহ দাখিল করিতে হইবে।

৭। সমন ও নোটিশ প্রেরণ ঃ (১) কোন পারিবারিক আদালতে কোন আর্জি দাখিল হইলে, উক্ত আদালত—

ক) সাধারণতঃ অনধিক ত্রিশদিনের মধ্যে বিবাদীর হাজির হওয়ার জন্য তারিখ ধার্য্য করিবেন ;

খ) নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হইয়া উপস্থাপিত দাবীর জবাব দানের জন্য বিবাদীকে সমন প্রেরণ করিবেন ;

গ) বিবাদীর বরাবর প্রাপ্তি স্বীকার পত্র সহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে মোকদ্দমার নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

২) উপধারা (১) মোতাবেক প্রেরিত প্রত্যেকটি সমনের সহিত ৬ (৩) ধারায় উল্লেখিত তফশীলের নকল, ৬ (৫) ধারায় উল্লখিত দলিলের নকল এবং ৬ (৬) ধারায় উল্লেখিত দলিলের ফিরিস্তি সংযোজিত থাকিতে হইবে।

৩) উপধারা (১) (খ) মোতাবেক প্রেরিত সমন দেওয়ানী কার্য বিধি কোষের ৫ নম্বর আদেশের ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯-ক, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ও ২৯ নং বিধি মোতাবেক জারীকৃত হইবে ; এবং অনুরূপভাবে জারীকৃত পরোয়ানা বিবাদীর উপর যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪) উপধারা (১) (গ) মোতাবেক বিবাদী বরাবরে প্রেরিত নোটিশ-এর প্রাপ্তি স্বীকার পত্র আদালতে ফেরত আসিলে, অথবা অনুরূপ প্রেরিত নোটিশটি বিবাদী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এই মর্মে ডাক কর্মচারীর লিখিত মন্তব্য সম্বলিত হইয়া আদালতে ফেরত আসিলে, নোটিশটি যথাযথ ভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শর্ত এই যে, নোটিশটি যথাযথভাবে ঠিকানাযুক্ত, ডাকমাশুল পরিশোধিত এবং প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত হইয়া থাকিলে এবং প্রেরণের তারিখ হইতে ত্রিশদিন অতিবাহিত হইলে নোটিশের প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র হারাইয়া গেলে বা বিপথে চালিত হইলেও অথবা উল্লেখিত সময়ের মধ্যে, অন্য কোন কারণে, উহা আদালতে ফেরত না আসিলেও, উহা বিবাদীর উপর যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫) উপধারা (১) (খ) অনুযায়ী প্রেরিত সমন জারীর খরচ দেওয়ানী কার্যবিধি কোষের অধীন অনুরূপ সমন জারীর খরচের সমান হইবে এবং (১) (গ) উপধারা মোতাবেক প্রেরিত নোটিশের ডাক-খরচ, আর্জি দাখিলের সময় বাদী কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

৮। লিখিত জওয়াব ঃ (১) বিবাদীর হাজিরার জন্য ধার্য তারিখে, বাদী ও বিবাদী পারিবারিক আদালতে হাজির হইবেন এবং বিবাদী তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জওয়াব দাখিল করিবেন।

২) বিবাদী পক্ষের সমর্থনে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করা হইবে উহাদের নাম ও ঠিকানাসহ একটি তফশীল এবং ঐ সকল সাক্ষীগণ যে বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত জওয়াবের অর্ন্তভুক্ত থাকিবে, শর্ত এই যে, আদালতের অনুমতিক্রমে, পরবর্তী যে কোন পর্যায়ে, বিবাদী অন্য সাক্ষী ডাকিতে পারেন, যদি আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে অনুরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ সমীচীন মনে করেন।

৩) বিবাদীর আত্মপক্ষের প্রমাণ তাহার দখলে বা আয়ত্বাধীনে কোন দলিলের উপর নির্ভরশীল হইলে, লিখিত জওয়াব দাখিলের সময় তিনি উহা আদালতে পেশ করিবেন এবং একই সঙ্গে তিনি অনুরূপ দলিল বা উহার অবিকল নকল বা ফটো নকল, লিখিত জওয়াবের সহিত দাখিল করিবেন।

৪) বিবাদীর আত্মপক্ষের প্রমাণ নিজের দখলে বা আয়ত্বাধীনে নাই এমন কোন দলিলের উপর নির্ভরশীল হইলে, তিনি অনুরূপ দলিলের বিষয়টি লিখিত জওয়াবের সহিত সংযোজনার্থে ফিরিস্তিভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট দলিল কাহার দখলাধীনে বা আয়ত্বাধীনে রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবেন।

৫) মোকদ্দমায় যতসংখ্যক বাদী রহিয়াছে, ততসংখ্যক তফশীল সহ লিখিত জওয়াবের অবিকল নকল তৎসহ (৩) নং উপধারায় উল্লেখিত দলিলসমূহের অবিকল নকল বা ফটো নকল এবং (৪) নং উপধারায় উল্লেখিত দলিল সমূহের তালিকা লিখিত জওয়াবের সহিত সংযোজিত হইবে।

৬) তফশীল সহ লিখিত জওয়াবের নকল, দলিলসমূহ এবং (৫) নং উপধারায় উল্লেখিত দলিলসমূহের তালিকা আদালতে উপস্থিত বাদীকে, তাহার পক্ষে কার্যকারককে অথবা এডভোকেটকে প্রদান করিতে হইবে।

৯। পক্ষগণের গরহাজিরার পরিণাম (Consequence of non-appearance of Parties) ঃ ১) বিবাদীর উপস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট দিনে, মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য ডাকা হইলে, কোন পক্ষই হাজির না থাকিলে আদালত মোকদ্দমাটি খারিজ করিতে পারেন।

২) মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য ডাকা হইলে, বাদী হাজির থাকিলে ও বিবাদী গরহাজির থাকিলে—

ক) যদি প্রমাণিত হয় যে, সমন বা নোটিশ বিবাদীর উপর যথাযথ জারী হইয়াছে, সেক্ষেত্রে আদালত এক তরফাভাবে অগ্রসর হইতে পারেন ;

খ) সমন বা নোটিশ বিবাদীর উপর যথাযথভাবে জারী হইয়াছে প্রমাণিত না হইলে, আদালত বিবাদীর উপর নূতন করিয়া সমন বা নোটিশ প্রেরণ ও জারী করার নির্দেশ দিবেন ;

গ) যদি প্রমাণিত হয় যে, বিবাদীর উপর সমন বা নোটিশ যথাযথভাবে জারী হইয়াছিল, তবে হাজির হওয়ার নির্ধারিত দিনে আদালতে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দানের জন্য বিবাদী যথেষ্ঠ সময় পায় নাই, তাহা হইলে আদালত পরবর্তী কোন এক তারিখে মোকদ্দমা শুনানীর জন্য মুলতবী রাখিবেন এবং অনুরূপ দিন সম্পর্কে বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

৩) আদালত কর্তৃক কোন মোকদ্দমার একতরফা শুনানী মুলতবী থাকিলে, এবং বিবাদী ধার্যকৃত তারিখে বা তৎপূর্বে আদালতে হাজির হইয়া ইতিপূর্বে গরহাজির থাকার গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাইলে, আদালত, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্তে, ইতিপূর্বে ধার্যকৃত দিনে বিবাদী হাজির হইলে যেভাবে শুনানী গ্রহণ করিতেন, অনুরূপ ভাবেই বিবাদীর জওয়াবের শুনানী গ্রহণ করিতে পারেন।

৪) মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য ডাকা হইলে বিবাদী পক্ষ হাজির এবং বাদীপক্ষ গরহাজির থাকিলে, বিবাদী বাদীর সম্পূর্ণ বা আংশিক দাবী স্বীকার না করিলে, আদালত মোকদ্দমাটি খারিজ করিবেন ; বিবাদী বাদীর দাবী সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে স্বীকার করিলে, আদালত বিবাদীর স্বীকৃতি অনুযায়ী বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করিবেন এবং অবশিষ্ট দাবীর বাবদ মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে।

৫) কোন মোকদ্দমা (১) নং উপধারা অনুসারে খারিজ হইলে বা (৪) নং উপধারা অনুসারে সম্পূর্ণ বা আংশিক খারিজ হইলে ত্রিশ দিনের মধ্যে হুকুমদানকরী আদালতে খারিজ হুকুমটি রদ করার জন্য, বাদী আবেদন করিতে পারেন এবং তিনি যদি আদালতকে এই মর্ম্মে সন্তুষ্ট করেন যে, মোকদ্দমাটি

শুনানীর জন্য ডাকার সময়ে তাহার গর হাজির থাকার সঙ্গত কারণ ছিল, সেক্ষেত্রে আদালত খারিজের হুকুমটি বাতিলের আদেশ দান করিবেন এবং মোকদ্দমাটি লইয়া অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি দিন ধার্য করিবেন। শর্ত এই যে, (৪) নং উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত মোকদ্দমা খারিজের হুকুমটি আদালত খরচা বা অন্য কিছু সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্তে বাতিল করিতে পারেন। আরও শর্ত এই যে, (৪) নং উপধারা অনুসারে প্রদত্ত মোকদ্দমা খারিজের কোন আদেশই, আবেদন পত্রের নোটিশ বিবাদীর উপর জারী না করিয়া, প্রদান করা হইবে না।

(৬) কোন বিবাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা ডিক্রি প্রদত্ত হইলে, ডিক্রি প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিবাদী উহা রদ করনার্থে আবেদন করিতে পারেন এবং তিনি যদি এই মর্ম্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করেন যে যখন মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য ডাকা হইয়াছিল, তখন তাহার গর হাজির থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল, সে ক্ষেত্রে আদালত বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত এক তরফা ডিক্রিটি, খরচা বা অন্য কিছু সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্তে, বাতিলের আদেশ প্রদান করিবেন এবং মোকদ্দমাটি লইয়া অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি দিন ধার্য করিবেন।

শর্ত এই যে, ডিক্রিটি যদি এমন প্রকৃতির হয় যে, শুধুমাত্র উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রীটি বাতিল করা যায় না, সেক্ষেত্রে সকল বিবাদীদের বা অন্য যে কোন বিবাদীর বিরুদ্ধেও ডিক্রিটি বাতিল করা যাইতে পারে ;

শর্ত এই যে, বিবাদীর আবেদনের নোটিশ বাদীর উপর জারী না করিয়া এই উপ-ধারা মোতাবেক কোন আদেশই প্রদান করা যাইবে না।

(৭) ১৯০৮ সনের তামাদি আইনের (১৯০৮ সনের ৯ নং আইনের) ৫ধারার বিধানাবলী (৬) উপ-ধারা অনুযায়ী দর-খাস্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১০। বিচার-পূর্ব কার্যাবলী (Pre-trial proceeding) ঃ

(১) লিখিত জওয়াব দাখিল হইলে, পারিবারিক আদালত সাধারণতঃ ত্রিশদিনের মধ্যে কোন একদিনে বিচার-পূর্ব শুনানীর তারিখ ধার্য করিবেন।

(২) আদালত বিচার-পূর্ব শুনানীর নির্ধারিত তারিখে আর্জি, লিখিত জওয়াব (থাকিলে), সাক্ষ্যের সারাংশ এবং পক্ষগণ কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং সমীচীন মনে করিলে পক্ষগণের বক্তব্য শুনিবেন।

(৩) বিচার-পূর্ব শুনানীতে আদালত পক্ষ-সমূহের বিরোধীয় বিচার্য বিষয় নিরুপণ করিবেন, এবং সম্ভব হইলে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মিমাংসার প্রচেষ্টা চালাইবেন।

(৪) আপোষ বা মিমাংসা সম্ভব না হইলে, আদালত মোকদ্দমার বিচার্য-বিষয় ধার্য করিবেন এবং সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

১১। নিভৃতে বিচার (Trial in Camera) ঃ (১) কোন পারিবারিক আদালত সমীচীন মনে করিলে এই অধ্যাদেশের অধীনে কার্যাবলী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিভৃতে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

(২) মোকদ্দমার উভয় পক্ষ আদালতকে নিভৃত বিচারের অনুরোধ জানাইলে, আদালত অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

১২। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণ (Recording of Evidence) ঃ

(১) সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের নির্ধারিত তারিখে, পারিবারিক আদালত উহার বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের আনীত স্বাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) আদালত কোন পক্ষের কোন স্বাক্ষীর উপর কোন সমন প্রেরণ করিবেন না, যদি না বিচার্য বিষয় স্থিরীকৃত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে কোন পক্ষ আদালতকে জ্ঞাত করান যে তিনি আদালতের মাধ্যমে সাক্ষীকে সমন করাইতে চাহেন

এবং আদালত এই মর্ম্মে সন্তুষ্ট হন যে, সমন না করিলে ঐ সাক্ষীকে উক্ত পক্ষ কর্তৃক আদালতে হাজির করা সম্ভবপর নহে।

(৩) সাক্ষীগণ তাহাদের নিজস্ব ভাষায় সাক্ষ্য দিবেন এবং তাহাদিগকে জেরা ও পুনঃ পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

(৪) আদালতের বিবেচনায় অশোভনীয়, কুৎসাজনক বা চপল অথবা অপমান কর, বিরক্তিকর বা অহেতুক আক্রমণাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন কোন প্রশ্ন আদালত নিষিদ্ধ করিতে পারেন।

(৫) আদালত উপযুক্ত মনে করিলে কোন মামলায় তৎ-বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যে কোন সাক্ষীর নিকট যে কোন প্রশ্ন রাখিতে পারেন।

(৬) আদালত কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য এফিডেবিটের মাধ্যমে প্রদানের অনুমতি দিতে পারেন ঃ

শর্ত এই যে, আদালত যথাযত মনে করিলে ঐরূপ সাক্ষীকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তলব করিতে পারেন।

(৭) প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতের বিচারক কর্তৃক আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতে হইবে এবং স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৮) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতের ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় প্রদত্ত হইলে, বিচারক সম্ভব হইলে সেই ভাষায় অনুরূপ সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতে পারেন এবং আদালতের ভাষায় উক্ত সাক্ষ্যের প্রামাণিক অনুবাদ রেকর্ডের একটি অংশ হইবে।

(৯) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিত হইলে, উহা তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে এবং প্রয়োজনবোধে উহা সংশোধন করা হইবে।

(১০) সাক্ষী সংশোধিত সাক্ষ্যের যে কোন অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, বিচারক সাক্ষ্য সংশোধনের পরিবর্তে, উক্ত সাক্ষীর আপত্তির একটি স্মারক প্রণয়ন করিবেন এবং উহাতে তিনি প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন করিবেন।

(১১) সাক্ষী যে ভাষায় সাক্ষ্যদান করিয়াছেন সেই ভাষা ব্যতীত, সাক্ষীর বোধগম্য নহে এমন কোন ভাষায় সাক্ষ্য লিখিত হইলে, সাক্ষ্য যে ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল সেই ভাষায় অথবা যে ভাষা তিনি বুঝেন সেই ভাষায় উহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইবে।

১৩। **বিচার সমাপ্তি** (Conclusion of trial) ঃ

১) সমস্ত পক্ষের সাক্ষ্য শেষ হওয়ার পর পারিবারিক আদালত পক্ষদিগের মধ্যে আপোষ বা মিমাংসার জন্য আর একবার চেষ্টা করিবেন।

(২) অনুরূপ আপোষ বা মিমাংসা সম্ভব না হইলে, আদালত রায় প্রদান করিবেন এবং রায়-এর পর ডিক্রি প্রদত্ত হইবে

১৪। **আপোষ ডিক্রি** (Compromise decree) ঃ আপোষ বা মিমাংসার মাধ্যমে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি হইলে, আদালত আপোষ বা মিমাংসার শর্তানুসারে ডিক্রি প্রদান করিবেন বা সিদ্ধান্ত দিবেন।

১৫। **রায় লিখন** (Writing of Judgment) ঃ

(১) পারিবারিক আদালতের প্রত্যেকটি রায় বা আদেশ উপবিষ্ট বিচারকের শ্রুতলিপি হইতে আদালতের ভাষায় লিখিত হইতে হইবে এবং উহা প্রকাশ্য আদালতে ঘোষনার সময়ে বিচারক কর্তৃক তারিখ যুক্ত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) আপীল যোগ্য সকল রায়ে বা আদেশে বিচার্য বিষয়, উহার উপর সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

১৬ **ডিক্রি বলবৎ করণ** (Enforcement of Decree) ঃ

(১) পারিবারিক আদালত, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে ডিক্রি প্রদান করিবেন এবং উহার বিবরণাদি ডিক্রির জন্য নির্ধারিত রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(২) ডিক্রি মোতাবেক আদালতে নগদ টাকা পরিশোধিত হইলে বা সম্পত্তি প্রদত্ত হইলে, অনুরূপ পরিশোধ ও প্রদানের বিষয়টি আদালত উল্লিখিত রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৩) অর্থ আদায় সংক্রান্ত ডিক্রিতে, ডিক্রির টাকা আদালতে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে পরিশোধিত না হইলে, ঐ অর্থ আদালতের নির্দ্দেশ সাপেক্ষে সরকারী পাওনা (Public Demand) হিসাবে আদায় হইবে এবং আদায় পূর্ব্বক ডিক্রিদারকে প্রদত্ত হইবে।

(৪) ডিক্রি দানকারী আদালত কর্তৃক ডিক্রি জারী হইবে অথবা জিলা জজের বিশেষ বা সাধারণ আদেশক্রমে অন্য কোন পারিবারিক আদালত কর্তৃক জারী হইবে।

(৫) আদালত সমীচীন মনে করিলে, তৎপ্রদত্ত কোন ডিক্রির দেনার অর্থ যথোপযুক্ত কিস্তিতে পরিশোধের হুকুম দিতে পারেন।

১৭। **আপীল** ঃ (১) উপধারা (২) এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে পারিবারিক আদালত প্রদত্ত রায়, ডিক্রি বা হুকুমের বিরুদ্ধে জিলা জজ আদালতে অপীল করা যাইবে।

(২) পারিবারিক আদালত প্রদত্ত কোন ডিক্রির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন আপীল করা যাইবে না—

(ক) ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের (১৯৩৯ সালের ৮ নং আইনের) ২(৮) (ঘ) ধারায় উল্লেখিত কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যতীত, অন্য কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে;

(খ) দেনমোহর পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধে না হইলে;

(৩) এই ধারা অনুযায়ী কোন আপীল, রায়, ডিক্রি বা হুকুমের নকল লাভ করিতে যে সময় ব্যয় হয় উহা বাদ দিয়া রায়, ডিক্রি বা হুকুমের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে; শর্ত এই যে, জেলা জজ আদালত যথেষ্ট কারণ থাকিলে, উল্লিখিত সময় সীমা বর্ধিত করিতে পারেন।

(৪) একটি আপীল অবশ্যই—

ক) লিখিতভাবে হইতে হইবে;

খ) যে সকল হেতুবাদে আপীলকারী রায়, ডিক্রি বা

হুকুমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন, উহাতে তাহার উল্লেখ থাকিবে ;

(গ) উহাতে পক্ষগণের নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা সমূহ উল্লিখিত থাকিবে ;

(ঘ) উহাতে আপীলকারীর স্বাক্ষর থাকিবে।

(৫) যে রায়, ডিক্রি বা হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইতেছে উহার প্রত্যায়িত নকল আপীলের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) জিলা জজ আদালতের যে কোন আদেশ যথাশীঘ্র সম্ভব পারিবারিক আদালতে প্রেরিত হইবে যদ্দারা পারিবারিক আদালতের রায় ডিক্রি বা হুকুম পরিবর্তিত বা সংশোধিত হইবে এবং ডিক্রি রেজিষ্টারের নির্ধারিত কলামে সেই মর্মে প্রয়োজনীয় ভুক্তি করিতে হইবে।

১৮। পারিবারিক আদালতের সাক্ষীদের সমন করিবার ক্ষমতা (Power of Family Court to summon witnesses) **ঃ**

(১) পারিবারিক আদালত যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া সাক্ষ্যদান বা কোন দলিল দাখিল করিতে বা করাইতে সমন প্রেরণ করিতে পারেন ;

(ক) শর্ত এই যে, দেওয়ানী কার্যবিধি কোষের ১৩৩ (১) ধারায় যে সকল ব্যক্তিকে কোন আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, অনুরূপ ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে হাজিরার আবশ্যক হইবে না ;

খ) কোন পারিবারিক আদালত যদি এরূপ মনে করেন যে, কোন মোকদ্দমায় অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির হাজিরা কেবলমাত্র অহেতুক বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার কারণ হইবে, সেই ক্ষেত্রে আদালত তাহার হাজির হওয়ার জন্য সমন প্রেরণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন বা সমন প্রেরিত হইয়া থাকিলেও উহা বলবৎ করিতে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

(২) পারিবারিক আদালত কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইতে এবং সাক্ষ্যদান করিতে বা কোন দলিল দাখিল করাইতে সমন প্রেরন করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সমন অমান্য করে, তবে আদালত, অনুরূপ অবাধ্যতা আমলে (Cognizance) আনিবেন ; এবং অনুরূপ ব্যক্তিকে উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা দানের সুযোগপ্রদানের পর অনধিক একশত টাকা জরিমানা করিতে পারেন।

১৯। পারিবারিক আদালত অবমাননা (Contempt of Family Courts) **ঃ** যে কোন ব্যক্তি পারিবারিক আদালত অবমাননার দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে—

(ক) পারিবারিক আদালতকে কোনরূপ অপমান করেন ;

(খ) পারিবারিক আদালতের কার্যে বিঘ্ন ঘটান ;

(গ) পারিবারিক আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত এবং উত্তর দানে বাধ্য এমন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রত্যাখ্যান করেন ; অথবা

ঘ) সত্য কথা বলিবার শপথ গ্রহণ করিতে প্রত্যাখ্যান করেন অথবা পারিবারিক আদালতে তাহার প্রদত্ত কোন ভাষ্যে স্বাক্ষর দান করিতে প্রত্যাখ্যান করেন ; এবং পারিবারিক আদালত তৎক্ষণাৎ আদালত অবমাননার দায়ে উক্ত ব্যক্তিকে বিচার করিতে এবং তাহাকে অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করিতে পারেন।

২০। কতিপয় আইনের প্রয়োগ ও অপ্রয়োগ (Application and non-application of certain laws) **ঃ**

(১) এই অধ্যাদেশে স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধান ব্যতিরেকে, ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের (১৮৭২ সালের ১নং আইনের) বিধান সমূহ এবং দেওয়ানী কার্যবিধি কোষের ১০ ও ১১ নং ধারার বিধান ব্যতিরেকে অন্যান্য বিধান সমূহ পারিবারিক আদালতের কার্যাবলীতে প্রযোজ্য হইবে না

(২) ১৮৭৩ সালের শপথ আইন (১৯৭৩ সালের ১০ নং আইন) পারিবারিক আদালতের সকল কার্যাবলীতে প্রযোজ্য হইবে।

২১। এজেন্টের মাধ্যমে হাজিরা (Appearance through agents) : এই অধ্যাদেশের অধীনে, সাক্ষী ব্যতীত, অন্য কোনরূপে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য আদিষ্ট কোন ব্যক্তি পর্দানশীন মহিলা হইলে, পারিবারিক আদালত তাহাকে যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্যকারকের প্রতিনিধিত্বে আদালতে হাজির হওয়ার অনুমতি দিতে পারেন।

২২। কোর্ট ফি (Court fee) : পারিবারিক আদালতে উপস্থাপিত যে কোন প্রকার মোকদ্দমার যে কোন প্রকারের আর্জির উপর পঁচিশ টাকা মাত্র কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে।

২৩। ১৯৬১ সালের ৮ নং অধ্যাদেশ প্রভাবিত হইবে না (Ordinance viii of 1961 not affected) :

(১) এই অধ্যাদেশের কোন কিছুই—১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন (১৯৬১ সালের ৮ নং আইন) বা উক্ত আইন মোতাবেক প্রণীত বিধিসমূহের কোন বিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(২) পারিবারিক আদালত মুসলিম আইন মোতাবেক অনুষ্ঠিত কোন বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ডিক্রিদান করিলে, আদালত ডিক্রিদানের তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে ডিক্রির সত্যায়িত নকল রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের (১৯৬১ সালের ৮ নং আইনের) ৭ ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন এবং চেয়ারম্যান উপরোক্ত অধ্যাদেশ মোতাবেক তালাকের সংবাদ পাইলে যেরূপ ব্যবস্থা লইতেন উপরোক্ত ডিক্রির নকল প্রাপ্তির পর তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) পারিবারিক আদালত প্রদত্ত, মুসলিম আইনে অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি—

(ক) ২ নং উপধারা মোতাবেক ডিক্রির নকল সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের প্রাপ্তির তারিখ হইতে নব্বইদিন অতিবাহিত না হইলে, কার্যকরী হইবে না ; এবং

(খ) অনুচ্ছেদ (ক) উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন (১৯৬১ সালের ৮ নম্বর আইন) মোতাবেক পক্ষগণের মধ্যে মিমাংসা হইয়া থাকিলে, কার্যকর হইবে না।

২৪। ১৮৯০ সালের ৮ নং আইনের উদ্দেশ্য সাধনে পারিবারিক আদালত জিলা আদালতরূপে গণ্য হইবে (Family Court deemed to be a District Court for purposes of Act viii of 1890)

(১) পারিবারিক আদালত ১৮৯০ সালের গার্জিয়ানস্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডস্ আইনের (১৮৯০ সালের ৮ নং আইনের) উদ্দেশ্যাবলী সাধনে জিলা আদালতরূপে গণ্য হইবে, এবং এই অধ্যাদেশে যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত আইনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী নিষ্পত্তিতে পারিবারিক আদালত, ঐ আইনে নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসরণ করিবেন।

(২) ১৮৯০ সালের গার্জিয়ানস্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডস আইনে (১৮৯০ সালের ৮ নং আইনে) যাহাই থাকুক না কেন, জিলা আদালতরূপে পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে জিলা-জজ আদালতে আপীল দায়ের করা যাইবে এবং (অত্র আইনের) ১৭ ধারার বিধানাবলী অনুরূপ আপীলের [ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।]

২৫। মোকদ্দমা ও আপীল স্থগিত এবং স্থানান্তরকরণ (Transfer and stay of suits and appeals) :

হাইকোর্ট বিভাগ, যে কোন পক্ষের আবেদনে অথবা স্বীয় উদ্যোগে, লিখিত আদেশক্রমে—

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীনে যে কোন মোকদ্দমা একই জেলার এক পারিবারিক আদালত হইতে অন্য পারিবারিক

আদালতে অথবা এক জেলার পারিবারিক আদালত হইতে অন্য জেলার পারিবারিক আদালতে, স্থানান্তর করিতে পারেন।

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীনে যে কোন আপীল এক জেলার জিলা-জজ আদালত হইতে অন্য কোন জেলার জিলা-জজ আদালতে স্থানান্তর করিতে পারেন।

(২) কোন জিলা-জজ, যে কোন পক্ষের আবেদনে অথবা স্বীয় উদ্যোগে এই অধ্যাদেশের অধীনে যে কোন মোকদ্দমা তাহার স্থানীয় এখতিয়ারাধীন এক পারিবারিক আদালত হইতে অন্য পারিবারিক আদালতে স্থানান্তর করিতে পারেন।

(৩) এই অধ্যাদেশে যাহাই থাকুক না কেন, জিলা-জজ এই অধ্যাদেশের কোন আপীল তাহার এজলাসে বিচারাধীন থাকিলে অনুরূপ আপীল অতিরিক্ত জিলা-জজ বা তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীন কোন সাব জজের এজলাসে স্থানান্তর করিতে পারেন এবং অনুরূপ কোন আদালত হইতে নিজ এজলাসে পুনঃ স্থানান্তর করিতে পারেন।

(৪) এই অধ্যাদেশে যাহাই থাকুক না কেন, এই ধারা মোতাবেক কোন মোকদ্দমা বা আপীল কোন আদালতে স্থানান্তরিত হইলে, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমা বা আপীলটি এমন ভাবে নিষ্পত্তির এখতিয়ার থাকিবে যেন উহা শুরুতেই ঐ আদালতে দায়ের করা হইয়াছিল; শর্ত এই যে, মোকদ্দমা স্থানান্তরিত হইলে স্থলাভিষিক্ত বিচারকের এজলাসে উক্ত মোকদ্দমার বিচার গোড়া হইতে শুরু (De novo) করার প্রয়োজন নাই, যদি বিচারক কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অন্যবিধ নির্দেশ দান না করেন।

(৫) জিলা জজ তাহার স্থানীয় এখতিয়ারাধীন কোন পারিবারিক আদালতে বিচারাধীন যে কোন মোকদ্দমা লিখিত আদেশে স্থগিত করিতে পারেন।

(৬) হাইকোর্ট বিভাগ, জিলা জজ আদালতে বা পরিবারিক

আদালতে বিচারাধীন যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল, লিখিত আদেশে স্থগিত করিতে পারেন।

২৬। বিধি প্রনয়ন ক্ষমতা (Power to make rules): এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলী কার্যকরী করণার্থে সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি প্রনয়ন করিতে পারিবেন।

২৭। বিচারাধীন কেস, সম্পর্কিত ব্যবস্থা (Provisions relating to pending cases): এই অধ্যাদেশে যাহাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার পূর্বে, ইহার ৫ ধারায় উল্লিখিত বিধান সম্পর্কিত বা উদ্ভূত বিচারাধীন যাবতীয় মোকদ্দমা, আপীল বা অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলী যে আদালতে বিচারাধীন, উক্ত আদালত কর্তৃক এমন ভাবে শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে যেন এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয় নাই।

এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখ ১২ই জুন ১৯৮৫ ( )

এইচ, এম, এরশাদ
লেফ.টন্যান্ট জেনারেল
প্রেসিডেন্ট

ঢাকা
২৮শে মার্চ, ১৯৮৫

মুসলিম পারিবারিক আইন

(১৯৬১ সালের ৮ নং অর্ডিন্যান্স)

(রাওয়ালপিণ্ডি, ২রা মার্চ, ১৯৬১)

[বিবাহ ও পরিবার আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ কার্যকরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত ।]

যেহেতু, বিবাহ ও পরিবার আইন কমিশনের, কতিপয় সুপারিশ কার্যকরী করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে ;

সেইহেতু, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের ঘোষণা এবং উহাতে বর্ণিত যাবতীয় ক্ষমতা অনুসারে প্রেসিডেন্ট নিম্নলিখিত অর্ডিন্যান্সটি প্রণয়ন ও জারী করিতেছেন ঃ

১ । সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, সীমা, প্রয়োগ ও বলবতের সময় ঃ

১) অত্র অর্ডিন্যান্সটিকে ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স'' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে ।

২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে এবং যেখানেই থাকুক না কেন বাংলাদেশের যাবতীয় মুসলিম নাগরিকদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে ।

৩) ১৯৬১ সালের ১৫ই জুলাই তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে ।

২ । সংজ্ঞা ঃ এই অধ্যাদেশে, বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গ হইতে বিপরীত কিছু প্রতীয়মান না হইলে—

ক) ''সালিস পরিষদ'' বলিতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও এই অর্ডিন্যান্সে আলোচিত বিষয়ে পক্ষসমূহের প্রত্যেকের একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কোন পরিষদকে বুঝাইবে (তবে, অবশ্য কোন পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত রূপ প্রতিনিধি ব্যাতিরেকে গঠিত পরিষদই সালিস পরিষদ হইবে ।) ;

খ) ''চেয়ারম্যান'' বলিতে—

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে ;

(২) পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে ;

(৩) মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মেয়র বা প্রশাসককে বুঝাইবে ;

(৪) এই অধ্যাদেশের অধীন চেয়ারম্যানের কৃত্য পালন করিবার জন্য ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সরকার কর্তৃক নিযুক্তব্যক্তিকে বুঝাইবে ;

(৫) যেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বাতিল করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিষদ পৌরসভা বা করপোরেশনের কৃত্য পালনকারী অথবা ক্ষেত্রমত, এই অধ্যাদেশের অধীন চেয়ারম্যানের কৃত্য পালন করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে ঃ

তবে, অবশ্য যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান একজন অমুসলমান অথবা তিনি নিজেই সালিস পরিষদের নিকট কোন দরখাস্ত করিতে চাহেন এমন হইলে, অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা উহার একজন মুসলমান সদস্যকে এই অধ্যাদেশের কৃত্য নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন ।

গ) ''মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন'' বলিতে ১৯৮২ সনের চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ৩৫), বা ১৯৮৩ সনের ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৪০), বা ১৯৮৪ সনের খুলনা মিউসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশের (১৯৮৪ সনের ৭২) অধীনে গঠিত এবং কথিত বিষয়ে যথানির্ধারিত এখতিয়ারের অধিকারী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে বুঝাইবে ;

ঘ) ''পৌরসভা'' অর্থ ১৯৭৭ সালের ২৬ নং পৌরসভা অধ্যাদেশের অধীন এবং এই বিষয়ে নির্ধারিত অধিক্ষেত্রসম্পন্ন পৌরসভাকে বুঝাইবে ;

ঙ) "নির্ধারিত" বলিতে ১১ ধারা অনুযায়ী প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ;

চ) "ইউনিয়ন পরিষদ" বলিতে ১৯৭৬ সালের ৯০ নং স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স অনুসারে গঠিত এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় এখতিয়ার সম্পন্ন ইউনিয়ন পরিষদকে বুঝাইবে।

৩। অত্র অর্ডিন্যান্স অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে ঃ

১) অপর কোন আইন, বিধি অথবা প্রচলিত রীতিতে যাহাই থাকুক না কেন, এই অর্ডিন্যান্সের বিধানাবলী কার্যকরী হইবে।

২) সন্দেহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে, এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালের সালিসী আইন (১৯৪০ সালের ১০ নং আইন), ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সালের ৫নং আইন) এবং আদালতের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণকারী অপর কোন আইনের কোন ব্যবস্থা সালিস পরিষদে প্রযোজ্য হইবে না।

৪। উত্তরাধিকার ঃ যাহার সম্পত্তি মিরাসে বন্টন হইবে, তাহার পূর্বে তাহার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি বন্টনের সময় উক্ত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তানাদি জীবিত থাকিলে, তাহারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাইবে, যাহা তাহাদের পিতা অথবা মাতা জীবিত থাকিলে পাইত।

৫। [ধারাটি ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রীকরণ আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

৬। বহুবিবাহ ঃ ১) পূর্বাহ্নে সালিস পরিষদের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি না লইয়া, কোন পুরুষ একটি বিবাহ বলবৎ থাকাকালে অপর একটি বিবাহ করিতে পারিবে না এবং পূর্বানুমতি গ্রহণ না করিয়া এই জাতীয় কোন বিবাহ হইলে তাহা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ [১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন] মোতাবেক রেজিস্ট্রী হইবে না।

২) উপরের (১) উপ ধারায় বর্ণিত অনুমতির জন্য নির্দিষ্ট ফিস জমা দিয়া, নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত বিবাহের কারণ এবং বর্তমান স্ত্রীগণের সম্মতি লওয়া হইয়াছে কি-না তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

৩) উপরোক্ত (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আবেদনপত্র পাইবার পর চেয়ারম্যান আবেদনকারী ও তাহার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে তাহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে বলিবেন এবং এইরূপে গঠিত সালিস পরিষদ যদি মনে করেন যে, প্রস্তাবিত বিবাহটি প্রয়োজন ও ন্যায়সঙ্গত, তাহা হইলে কোন শর্ত থাকিলে উহা সাপেক্ষে, প্রার্থিত বিবাহের অনুমতি মঞ্জুর করিতে পারেন।

৪) আবেদনপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্তকালে, সালিস পরিষদ উহার সিদ্ধান্তের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোন পক্ষ, নির্দিষ্ট ফিস জমা দিয়া, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট মুন্সেফের নিকট পুনর্বিচারের আবেদন করিতে পারেন এবং উহাতে মুন্সেফের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫) যে পুরুষ সালিস পরিষদের অনুমতি ব্যতীত আর একটি বিবাহ করিবে, তাহাকে—

ক) অবিলম্বে তাহার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের "তাৎক্ষনিক" অথবা 'বিলম্বিত" দেনমোহরের যাবতীয় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে এবং উক্ত অর্থ পরিশোধ করা না হইলে উহা বকেয়া রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে ; এবং

খ) অভিযোগক্রমে অভিযুক্ত হইলে সে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

৭। তালাক ঃ (১) কোন পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে চাহিলে, তিনি যে কোন পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র

সন্তব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিবেন এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের নকল প্রদান করিবেন।

২) যে কোন ব্যক্তি (১) উপ-ধারার বিধান লংঘন করিবে, সে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

৩) নিম্নের (৫) উপ-ধারার ব্যবস্থাবলীর মাধ্যম ব্যতীত কোন তালাক, পূর্বাহ্নেই প্রকাশ্যে বা অন্যভাবে প্রত্যাহৃত না হইলে, (১) উপ-ধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না।

৪) উপরোক্ত (১) উপ-ধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে, সালিস পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত সালিস পরিষদ এই জাতীয় পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করিবেন।

৫) তালাক ঘোষণাকালে স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে, উপরের (৩) উপ-ধারায় উল্লেখিত সময় অথবা গর্ভাবস্থা, এই দুইটির মধ্যে দীর্ঘতরটি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, তালাক বলবৎ হইবে না।

৬) অত্র ধারা অনুযায়ী কার্যকরী তালাক দ্বারা যাহার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই স্ত্রী এই জাতীয় তালাক তিনবার এইভাবে কার্যকরী না হইলে, কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ না করিয়া পুনরায় একই স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

৮। তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ যেখানে তালাকের অধিকার স্ত্রীকে যথাযথভাবে প্রদান করা হইয়াছে, এবং স্ত্রী যেখানে উক্ত অধিকারটি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক, অথবা যেখানে স্বামী বা স্ত্রী তালাক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে চাহে, সেখানে ৭ ধারার বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

৯। খোরপোশ ঃ (১) কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে পর্যপ্ত খোরপোশ দানে ব্যর্থ হইলে, অথবা একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদিগকে সমান খোরপোশ না দিলে, স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণ, অথবা স্ত্রীগণের কেহ, আইন অনুসারে অপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও, চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি সালিসী পরিষদ গঠন করিবেন, এবং উক্ত সালিসী পরিষদ স্বামী কর্তৃক খোরপোশ হিসাবে দেয় টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবেন।

২) স্বামী অথবা স্ত্রী নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও নির্ধারিত ফিস জমা দিয়া ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটখানা পুনবিবেচনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মুন্সেফের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং উহাতে সংশ্লিষ্ট মুন্সেফের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৩) উপরের (১) অথবা (২) উপ-ধারা মোতাবেক দেয় কোন অর্থ যথাসময়ে প্রদান করা না হইয়া থাকিলে, উহা বকেয়া রাজস্বের আকারে আদায়যোগ্য হইবে ।

১০। দেনমোহর ঃ নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, দেনমোহরের সমগ্র অর্থ চাহিবামাত্র দেয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

১১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ ১) অত্র অডিন্যান্সের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

২) অত্র ধারা অনুযায়ী বিধি প্রণয়নকালে, ঐ সকল বিধির কোনটি কেহ ভঙ্গ করিলে এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ড ভোগ করিবে এই মর্মে সরকার বিধান করিতে পারেন।

৩) অত্র ধারায় প্রণীত বিধিসমূহ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে, এবং অতঃপর সেগুলি অত্র অডিন্যান্সে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের (১৯২৯ সালের ১৯ নং আইনের) সংশোধন ঃ ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে (১৯২৯ সালের ১৯ নং আইনে)—

১) ২ ধারায়—

ক) দফা (ক)-তে "চৌদ্দ" শব্দটির স্থলে "ষোল" শব্দটি স্থলাভিষিক্ত করিতে হইবে ;

খ) দফা (গ)-তে ব্যবহৃত "এবং" শব্দটি বাদ দিতে হইবে ; এবং

গ) দফা (ঘ)-র শেষে পূর্ণচ্ছেদের স্থলে একটি কমা বসাইতে হইবে এবং অতঃপর নিম্নলিখিত নূতন দফা (ঙ), (চ), ও (ছ) যোগ করিতে হইবে, যথা ঃ

ঙ) "মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন" বলিতে ১৯৮২ সনের চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ৩৫), বা ১৯৮৩ সনের ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৪০), বা ১৯৮৪ সনের খুলনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশের (১৯৮৪ সনের ৭২) অধীনে গঠিত মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে বুঝাইবে যাহার এখতিয়ারের মধ্যে কোন বাল্য-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে বা হইতে যাইতেছে ;

চ) পৌরসভা অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অডিন্যান্স [১৯৭৭ সালের ২৬ নং অধ্যাদেশ] অনুযায়ী গঠিত পৌরসভা—যাহার এলাকার মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ হইতেছে বা হইতে যাইতেছে।

ছ) ইউনিয়ন পরিষদ অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অডিন্যান্স [১৯৭৬ সালের ৯০ নং অধ্যাদেশ] অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ—যাহার এলাকার মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ হইতেছে বা হইতে যাইতেছে।

২) ৩ ধারাটি বাদ দিতে হইবে।

৩) ৪ ধারায় "একুশ" শব্দটির স্থলে "আঠার" শব্দটি বসাইতে হইবে।

৪) ৯ ধারায় "অত্র আইন অনুযায়ী" শব্দগুলির পর "ইউনিয়ন পরিষদ ; অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা না থাকিলে সরকার কর্তৃক উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অভি-যোগ ব্যতীত কোন অবস্থায় এইরূপ মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করা যাইবে না" শব্দগুলি বসাইতে হইবে ; এবং

৫) ১১ ধারাটি বাদ যাইবে।

১৩। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের (১৯৩৯ সালের ৮ নং আইনের) সংশোধন ঃ ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের (১৯৩৯ সালের ৮ নং আইনের) ২ ধারায় —

ক) দফা (ii) এর পর নিম্নলিখিত নূতন উপ-দফা (ii-ক) বসাইতে হইবে, যথা ঃ

"(ii-ক) যেহেতু স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবার আইন অডিন্যান্সের ব্যবস্থাবলী লঙ্ঘন করিয়া একজন অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে" ; এবং

খ) (vii) শাখা দফায় "পনের" শব্দটির স্থলে "ষোল" শব্দটি স্থলাভিষিক্ত হইবে।

১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন

(১লা অক্টোবর, ১৯২৯)

[১৯২৯ সালের ১৯ নং এ্যাক্ট]

[বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান নিরোধকল্পে আনীত আইন]

বাল্যবিবাহ নিরোধ সমীচীন বিধায়, এতদ্বারা নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ** ক) অত্র আইনটিকে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বলা যাইতে পারে।

খ) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকরী হইবে, এবং যে যেখানেই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রেই এই আইনটি প্রযোজ্য হইবে।

গ) আইনটি ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয়বস্তু কিংবা প্রসঙ্গের মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন কিছু না থাকিলে, অত্র আইনে—

ক) "শিশু" বা "নাবালক" বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার বয়স পুরুষ হইলে একুশ বৎসরের নীচে এবং স্ত্রী হইলে আঠারো বৎসরের নীচে হইবে ;

খ) "বাল্যবিবাহ" বলিতে ঐ বিবাহকে বুঝাইবে যাহাতে পক্ষদ্বয়ের যে কোন একজন শিশু হইবে ;

গ) "বিবাহের পক্ষ" বলিতে যে দুইজনের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথবা হইতে চলিয়াছে এমন যে কোন একজনকে বুঝাইবে ;

ঘ) "নাবালক" বলিতে পুরুষ হইলে একুশ বৎসরের নিচে এবং স্ত্রী হইলে আঠারো বৎসরের নিচে এমন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে ;

ঙ) "মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন" বলিতে ১৯৮২ সনের চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ৩৫), বা ১৯৮৩ সনের ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৪০), বা ১৯৮৪ সনের খুলনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশের (১৯৮৪ সনের ৭২) অধীনে গঠিত মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে বুঝাইবে যাহার এখতিয়ারের মধ্যে কোন বাল্য-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ;

চ) পৌরসভা অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অডিন্যান্স [১৯৭৭ সালের ২৬ নং অধ্যাদেশ] অনুযায়ী গঠিত পৌরসভা যাহার এলাকার মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ হইতেছে বা হইতে যাইতেছে।

ছ) ইউনিয়ন পরিষদ অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার অডিন্যান্স [১৯৮৩ সালের ৫১ নং অধ্যাদেশ] অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ যাহার এলাকার মধ্যে কোন বাল্যবিবাহ হইতেছে বা হইতে যাইতেছে।

৩। ... ...

৪। **শিশু বিবাহকারীর শাস্তি ঃ** একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ বা আঠারো বৎসরের অধিক বয়স্কা কোন মহিলা কোন শিশুর সহিত বিবাহের চুক্তি সম্পাদন করিলে, তাহার এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই হইতে পারে।

৫। **বিবাহ সম্পন্নকারীর শাস্তি ঃ** যে কোন ব্যক্তি নাবালকের বিবাহ সম্পন্ন করিলে কিংবা উক্ত বিবাহ পরিচালনা করিলে অথবা উহা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিলে, যদি সে ব্যক্তি প্রমাণ করিতে না পারে যে, বিবাহটি নাবালকের বিবাহ ছিল না বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় প্রকারের শাস্তিই হইতে পারে।

৬। অভিভাবকের শাস্তিঃ ১) যেখানে কোন নাবালক বাল্যবিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং পিতামাতা কিংবা আইনানুগ অথবা বেআইনী যে কোন ক্ষমতাবলেই হউক না কেন, কোন ব্যক্তি ঐ নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উক্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করিবার পথে কোন কায করিতে কিংবা উহা সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিতে অথবা বিবাহটি বন্ধ করিবার ব্যাপারে গাফিলতির দরুন ব্যর্থ হইয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাহার এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা কেবল জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই হইতে পারে।

তবে অবশ্য কোন স্ত্রীলোককে কারাদণ্ড দেওয়া হইবে না।

২) অত্র ধারার ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করিবার নিমিত্ত যেখানে কোন নাবালক বাল্যবিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীতটি প্রমাণিত না হয়, উক্ত নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি গাফিলতির কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

৭। অনাদায়ে কারাদণ্ড হইবে নাঃ ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ্ এ্যাক্ট-এর ২৫ ধারা কিংবা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৬৪ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, অত্র আইনের ৩ ধারা বলে কোন আদালত কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিলে, এমন কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন না যে, তাহার উপর আরোপিত জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

৮। এখতিয়ারঃ ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত কোন আদালতই অত্র আইনের কোন অপরাধ স্বীয় বিচারাধীনে লইতে পারিবেন না কিংবা উহার বিচার করিতে পারিবেন না।

৯। অপরাধের আমল়ঃ কোন আদালতই অত্র আইনের আওতায় কোন অপরাধ [একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা না থাকিলে, এই মর্মে সরকারের অনুমোদনক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগ ব্যতীত] যে তারিখে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে এক বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১০। প্রারম্ভিক অনুসন্ধানঃ কোন আদালত অত্র আইনের আওতায় কোন অপরাধের অভিযোগ স্বীয় বিচারাধীনে লইলে উক্ত আদালত ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারার বিধান মোতাবেক উহা নাকচ না করা পর্যন্ত উক্ত আইনের ২০২ ধারা মোতাবেক স্বয়ং অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করিবেন অথবা তাঁহার অধীনস্থ ১ম শ্রেণীর কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন।

১১। ... ...

১২। নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতাঃ ১) অত্র আইনে বিপরীত কোন কিছু থাকিলেও, আদালতের নিকট কোন অভিযোগ কিংবা অন্য কোন উপায়ে এই মর্মে তথ্য পেশ হইলে যে, উক্ত আইনের বিধানের লংঘনে কোন নাবালকের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিংবা বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে তাহা হইলে আদালত সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ অত্র আইনের ৪, ৫ ও ৬ ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের যে কোন একজনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারেন।

২) পূর্বাহ্নে আদালত ঐ ধরণের ব্যক্তিকে নোটিশ না দিয়া এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য তাহাকে কোন সুযোগ দান না করিয়া (১) উপ-ধারা অনুযায়ী ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেন না।

৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত কোন নির্দেশ আদালত স্বীয় উদ্যোগে অথবা কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনে নাকচ কিংবা পরিবর্তন করিতে পারেন।

৪) এই জাতীয় কোন দরখাস্ত পাইলে, আদালত আবেদনকারীকে স্বয়ং অথবা উকিলের মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সুযোগ প্রদান করিবেন এবং আদালত যদি দরখাস্তখানা সামগ্রিক কিংবা আংশিকভাবে নাকচ করিয়া দেন, তাহা হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫) অত্র ধারার (১) উপ-ধারা বলে কোন ব্যক্তির উপর নিষে-ধাজ্ঞা আরোপিত করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া যদি সে ব্যক্তি উহা অমান্য করে তাহা হইলে তাহাকে সশ্রম কিংবা বিনাশ্রম—যে কোন প্রকারের তিন মাস মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা কেবল এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই দেওয়া যাইতে পারে।

তবে, অবশ্য কোন মহিলাকে কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে না।

—০—

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন

(১৯৩৯ সালের ৮ নং আইন)

১৯৩৯ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতিপ্রাপ্ত ঃ

[মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিতা মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের উপর আনীত মামলা সম্পর্কিত মুসলিম আইনের বিভিন্ন ব্যবস্থাবলী একত্রীকরণ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যার জন্য এবং বিবাহিতা মুসলমান মহিলার ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের ফলে তাহার বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীকরণার্থে প্রণীত এ্যাক্ট।]

যেহেতু, মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিতা মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের উপর আনীত মামলা সম্পর্কিত মুসলিম আইনের বিভিন্ন ব্যবস্থা একত্রীকরণ ও উহাদের পরিষ্কার ব্যাখ্যার জন্য এবং বিবাহিতা মুসলমান মহিলার ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের ফলে তাহার বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীকরণার্থে, এক্ষণে প্রয়োজন অনুভব করা যাইতেছে, সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নলিখিত আইন পাশ করা হইতেছে ঃ

১। (১) **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ** অত্র আইনকে ১৯৩৯ সালের মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদ আইন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির হেতুবাদ ঃ** নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক হেতুবাদে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিতা কোন মহিলা তাহার বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রি লাভের অধি-কারিণী হইবেন, যথা ঃ

i) চার বৎসর যাবৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে;

ii) স্বামী দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দানে অবহেলা প্রদর্শন করিলে অথবা ব্যর্থ হইলে;

ii-ক) স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ব্যবস্থা লংঘন করিয়া অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিলে;

iii) স্বামী সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে;

iv) স্বামী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত তিন বৎসর যাবৎ তাহার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে;

v) বিবাহকালে স্বামীর পুরুষত্বহীনতা থাকিলে এবং উহা বর্তমানেও চলিতে থাকিলে;

vi) দুই বৎসর যাবৎ স্বামী পাগল হইয়া থাকিলে অথবা কুষ্ঠ ব্যাধিতে কিংবা ভয়ানক ধরনের উপদংশ রোগে ভুগিতে থাকিলে;

vii) ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহাকে তাহার পিতা অথবা অন্য অভিভাবক বিবাহ করাইয়া থাকিলে এবং আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে উক্ত বিবাহ অস্বীকার করিয়া থাকিলে;

তবে, অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে যদি দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে;

viii) স্বামী তাহার (স্ত্রীর) সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, অর্থাৎ—

ক) অভ্যাসগতভাবে তাহাকে আঘাত করিলে বা নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা, উক্ত আচরণ দৈহিক পীড়নের পর্যায়ে না পড়িলেও, তাহার জীবন শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে এমন হইলে;

খ) স্বামীর দুর্নাম রহিয়াছে বা কলঙ্কিত জীবন যাপন করে এমন স্ত্রীলোকদের সহিত মেলামেশা করিলে, অথবা

গ) তাহাকে দুর্নীত জীবন যাপনে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলে, অথবা

ঘ) তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান করিলে, অথবা

ঙ) তাহার ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করিলে, অথবা

চ) একাধিক স্ত্রী থাকিলে, সে কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহার সঙ্গে আচরণ না করিলে;

ix) মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য বৈধ হেতু হিসাবে স্বীকৃত অন্য যে কোন কারণে;

তবে, অবশ্য—

ক) কারাদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত ৩ নং হেতুবাদে কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না;

খ) ১ নং হেতুবাদে প্রদত্ত ডিক্রিটি উহার প্রদানের তারিখ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না এবং স্বামী উক্ত সময়ের মধ্যে স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে যদি আদালতকে খুশী করিতে পারে যে, সে দাম্পত্য কর্তব্য পালনে প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রিটি রদ করিবেন; এবং

গ) ৫ নং হেতুবাদে ডিক্রি প্রদানের পূর্বে, স্বামীর আবেদনক্রমে আদালতের আদেশের এক বৎসরের মধ্যে সে পুরুষত্বহীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে বা তাহার পুরুষত্বহীনতার অবসান ঘটিয়াছে, এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আদালত তাহাকে আদেশ দান করিতে পারেন এবং যদি সে উক্ত সময়ের মধ্যে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত হেতুবাদে কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না।

৩। স্বামীর ঠিকানা জানা না থাকিলে তাহার উত্তরাধিকারীগণের উপর নোটিশ জারী করিতে হইবেঃ

যে মামলায় ২ ধারার (১) উপ-ধারা প্রযোজ্য, সেখানে—

ক) আর্জিতে ঐ সমস্ত লোকের নাম-ঠিকানা লিখিতে হইবে যাহারা আর্জি পেশ করিবার সময় স্বামী মারা গেলে মুসলিম আইনে স্বামীর উত্তরাধিকারী হইতেন;

খ) ঐ ধরনের ব্যক্তিগণের উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে, এবং

গ) উক্ত মামলায় ঐ সকল ব্যক্তির বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।

তবে, অবশ্য, স্বামীর চাচা ও ভাই থাকিলে উহারা উত্তরাধিকারী না হইলেও উহাদিগকে অবশ্যই পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

৪। ধর্মান্তরের ফল ঃ কোন বিবাহিতা মুসলমান মহিলা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিলে অথবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উহাতেই তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

তবে, অবশ্য এই জাতীয় ধর্মত্যাগ বা অন্য ধর্ম গ্রহণের পর মহিলাটি ২ ধারায় বর্ণিত অন্য যে কোন হেতুবাদে তাহার বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রি গ্রহণের অধিকারিনী হইবে ঃ

আরও এই যে, অত্র ধারার ব্যবস্থাবলী ঐ মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে অন্য কোন ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে স্বীয় পুরাতন ধর্মে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিল।

৫। দেনমোহরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না ঃ অত্র আইনে সন্নিবেশিত কোন কিছুই কোন বিবাহিতা মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে মুসলিম আইন অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য দেনমোহর অথবা উহার কোন অংশের উপর তাহার কোন অধিকারকেই ক্ষুণ্ণ করিবে না।

৬। ১৯৩৭ সালের মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগ আইনের ৫ ধারাটিকে এতদ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হইল [১৯৪২ সালের ২৫ নং এ্যাক্ট দ্বারা বাতিল ঘোষিত হয়)]।

১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রেশন) আইন

(১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন)

[মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন সমূহ একত্রীকরণ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন]

যেহেতু, মুসলিম বিবাহ এবং তালাক রেজিস্ট্রীকরণ সম্পর্কিত আইন সমূহ একত্রীকরণ ও সংশোধন যুক্তিযুক্ত ঃ

সেইহেতু, নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রয়োগ –(১) অত্র আইন ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ এবং তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন নামে অভিহিত হইবে।

(২) অত্র আইন যে কোন স্থানে বসবাসরত বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ – অত্র আইনে, প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুতে বিরোধী কিছু না থাকিলে,—

(ক) 'ইনসপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন' এবং 'রেজিস্ট্রার' বলিতে যথাক্রমে ১৯০৮ সালের 'রেজিস্ট্রেশন' আইন (১৯০৮ সালের ১৬ নং আইন) অনুসারে উক্ত পদে মনোনীত ও নিযুক্ত অফিসারকে বুঝাইবে ;

(খ) 'নির্ধারিত' বলিতে অত্র আইন অনুসারে প্রণীত বিধান দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।

৩। বিবাহ রেজিস্ট্রীকরণ ঃ অন্য যে কোন আইন, রেওয়াজ বা প্রথায় যাহাই থাকুক না কেন, মুসলিম আইন অনুযায়ী সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহ এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিস্ট্রী করিতে হইবে।

৪। নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণ ঃ অত্র আইন অনুসারে বিবাহ রেজিস্ট্রীকরণের উদ্দেশ্যে, সরকার যেমন আবশ্যক মনে করিবেন এমন সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য লাইসেন্স প্রদান করিবেন, এবং ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার বলা হইবে।

তবে অবশ্য, কোন এক এলাকার জন্য একজনের বেশী নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

৫। নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই এমন বিবাহ সম্পর্কে তাহাদের নিকট প্রতিবেদন দিতে হইবে ঃ (১) নিকাহ্ রেজিস্ট্রার কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই এমন প্রতিটি বিবাহ এই আইন অনুসারে রেজিস্ট্রী করার জন্য যিনি বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন, তৎকর্তৃক নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর বিধান যে কোন ব্যক্তি লংঘন করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

৬। তালাকসমূহ রেজিস্ট্রীকরণ ঃ (১) রেজিস্ট্রীর নিমিত্ত কোন আবেদনে, একজন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় মুসলিম আইন অনুসারে কার্যকরীকৃত তালাক রেজিস্ট্রী করিতে পারিবেন।

(২) যিনি বা যাহারা তালাক কার্যকরী করিয়াছেন তিনি বা তাহারা তালাক রেজিস্ট্রী করার জন্য মৌখিকভাবে আবেদন করিবেন।

তবে অবশ্য, তালাক প্রদানকারিণী যদি পর্দানশীন মহিলা হন তবে তেমন দরখাস্ত তাঁহার যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল করিতে পারিবেন।

(৩) নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের সম্মুখে স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন এই মর্মে ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯০৮ সালের ১৬নং আইন) মোতাবেক রেজিস্ট্রীকৃত দলিল উপস্থাপন করা না হইলে, অথবা ঐরূপ ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পিত হইয়াছিল এই

মর্মে বিবাহ রেজিস্ট্রী বহিতে ভুক্তির নকল পেশ করা না হইলে, নিকাহ্ রেজিস্ট্রার তালাক-ই-তৌফিজ জাতীয় তালাক রেজিস্ট্রী করিবেন না।

(৪) নিকাহ্ রেজিস্ট্রার তালাক রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান করিলে, রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ঐ প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সমীপে আপীল করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত আপীলে রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৭। রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতি ঃ নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রী করিবেন।

৮। রেজিস্ট্রী বহি ঃ প্রত্যেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নির্ধারিত ফরমে বিবাহ এবং তালাকের পৃথক রেজিস্ট্রী বহি রক্ষা করিবেন এবং অনুরূপ রক্ষিত প্রতিটি রেজিস্টারে ভুক্তির সংখ্যামালা ক্রমিক-ভাবে নম্বরযুক্ত করিবেন এবং প্রত্যেক বৎসরের শুরুতে নূতন সংখ্যা-মালা শুরু হইবে।

৯। পক্ষসমূহকে অন্তর্ভুক্তির নকল প্রদান ঃ যে-কোন বিবাহ বা তালাকের রেজিস্ট্রীকরণ সম্পন্ন হইবার পর, নিকাহ্ রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির সত্যায়িত নকল প্রদান করিবেন এবং এই বাবদ কোন ফীস আরোপিত হইবে না।

১০। নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান ঃ (১) প্রত্যেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রার তাঁহার দফতরের কৃত্যসমূহ রেজিস্ট্রারের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বা-বধানে নিষ্পন্ন করিবেন।

(২) 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন' সকল নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের দফতরের উপর সার্বিক তত্ত্বাবধান প্রয়োগ করিবেন।

১১। লাইসেন্স রদকরণ বা সাময়িক রদকরণ ঃ যদি সরকার মনে করেন যে, একজন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার তাঁহার কর্তব্য-সমূহ সম্পাদনে কোন অসদাচরণের দোষে দোষী বা অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন বা তাহার কর্তব্য সম্পাদনে দৈহিকভাবে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তবে লিখিত আদেশ দ্বারা তাঁহার লাইসেন্স রদ করিতে বা লাইসেন্স সাময়িকভাবে রদ করিতে পারিবেন, অবশ্য তেমন

সাময়িক রদের মেয়াদ দুই বছরের বেশী হইবে না এবং উহা আদেশে নির্দিষ্টরূপে উল্লিখিত থাকিতে হইবে ;

তবে, অবশ্য নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে কেন তেমন আদেশ প্রদান করা হইবে না, উহার কারণ প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া উপরোক্ত আদেশ দেওয়া যাইবে না।

১২। **রেজিস্ট্রী বহিসমূহের হেফাজত ঃ** প্রত্যেক নিকাহ রেজিস্ট্রার অত্র আইনের ৮ ধারা অনুসারে তৎকর্তৃক রক্ষিত প্রতিটি রেজিস্টার লিখিয়া পূর্ণ না করা পর্যন্ত হেফাজতে রাখিবেন এবং যদি তিনি ইহার পূর্বে জিলা ত্যাগ করেন বা তাঁহার লাইসেন্স আর না থাকে, তবে নিরাপদ হেফাজতের জন্য উহা রেজিস্ট্রারের নিকট জমা দিবেন।

১৩। **রেজিস্ট্রী বহিসমূহ পরিদর্শন ঃ** নির্ধারিত ফীস জমা দেওয়ার পর যেকোন ব্যক্তি যে-কোন নিকাহ রেজিস্ট্রারের দফতরে রক্ষিত যে-কোন রেজিস্টার পরিদর্শন করিতে বা তাহাতে সন্নিবেশিত যে-কোন ভুক্তির নকল লইতে পারিবেন।

১৪। **বিধিবলী প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ** ১) সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিধিবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

২) বিশেষভাবে এবং উপরোল্লিখিত ক্ষমতার সার্বিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া সরকার এতদ্ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন ঃ

ক) ৪ নং ধারা অনুসারে যাঁহাদের লাইসেন্স দেওয়া হইবে, তাঁহাদের আবশ্যকীয় যোগ্যতা নির্ধারণ সম্পর্কে ;

খ) বিবাহ বা তালাক রেজিস্ট্রীকরণের জন্য একজন নিকাহ রেজিস্ট্রারকে দেয় ফীসের অংক নির্ধারণ সম্পর্কে ;

গ) অপর যে-কোন বিষয়, যাহার জন্য বিধি প্রণয়ন আবশ্যক, উহা সম্পর্কে।

১৫। **১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স (১৯৬১ সালের ৮ নং অর্ডিন্যান্স) সংশোধন ঃ** ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স—

(ক) ৩ নং ধারার (১) নং উপ-ধারায় উল্লিখিত কমা এবং নিম্নোক্ত শব্দাবলী "এবং মুসলিম বিবাহসমূহে কেবল-মাত্র উপরোক্ত বিধানাবলী মোতাবেক রেজিস্ট্রী হইবে" বাদ যাইবে।

(খ) ৫ নং ধারা বাদ যাইবে ;

(গ) ৬ নং ধারার (১) নং উপ-ধারায় "অত্র অর্ডিন্যান্স অনুসারে" শব্দের পরিবর্তে "১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ এবং তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন অনুসারে" শব্দাবলী, কমা, সংখ্যা এবং ব্র্যাকেটসহ বসিবে (১৯৭৪ ····)।

১৬। **বাতিল ঃ** ১৮৭৬ সালের মুসলিম তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন (১৮৭৬ সালের ১নং বঙ্গীয় আইন) এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

১৭। **বর্তমান নিকাহ রেজিস্ট্রারদের সম্পর্কে বিধান ঃ** এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স [১৯৬১ সালের ৮ নং অর্ডিন্যান্স] অনুসারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ এই আইন অনুসারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন,

(১৯৮০ সালের ৩৫ নং আইন)

[বিবাহে যৌতুক গ্রহণ ও প্রদান নিরোধকল্পে প্রণীত আইন]

যেহেতু, বিবাহসমূহে যৌতুক গ্রহণ ও প্রদান রদকল্পে বিধান করা সমীচীন ;

সেইহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ**—[১] এই আইন ১৯৮০ সালের "যৌতুক নিরোধ আইন" নামে অভিহিত হইবে।

[২] সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে "যৌতুক" বলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা "মূল্যবান জামানত"কে বুঝাইবে, যাহা—

ক) বিবাহের এক পক্ষ অপর পক্ষকে, অথবা

খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে—

বিবাহ মজলিশে অথবা বিবাহের পূর্বে বা পরে, বিবাহের পণরূপে প্রদান করে বা প্রদান করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় ; তবে, যৌতুক বলিতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বুঝাইবে না।

ব্যাখ্যা—১। সন্দেহ নিরসনকল্পে এতদ্বারা জ্ঞাত করা হইল যে, বিবাহের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত নহেন এমন কোন ব্যক্তি

কর্তৃক স্বামী বা স্ত্রী, যে কোন পক্ষকে অনধিক পাঁচশত টাকা মূল্যমানের কোন জিনিস, বিবাহের পণ হিসাবে নহে, উপঢৌকনরূপে প্রদান করিলে, অনুরূপ উপঢৌকন এই ধারা মতে যৌতুক হিসাবে গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ—২। দণ্ডবিধির (ইং ১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইনের) ৩০ ধারায় "মূল্যবান জামানত" যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই আইনেও ঐ শব্দাবলী একই অর্থ বুঝাইবে।

৩। যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের দণ্ডঃ এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করিলে অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করিলে, সে সর্বাধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড বা সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

৪। যৌতুক দাবী করার দণ্ডঃ এই আইন কার্যকরী হওয়ার পর কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবী করিলে, সে সর্বাধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

৫। যৌতুক প্রদান ও গ্রহণের চুক্তি বাতিলঃ যৌতুক প্রদান অথবা গ্রহণের সকল প্রকার চুক্তি বাতিল হইবে।

৬।

৭। অপরাধসমূহের আমলঃ ইং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি কোষে (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইনে) যাহাই থাকুক না কেন—

(ক) এই আইনের কোন অপরাধ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিম্নের কোন আদালত বিচার করিবেন না;

(খ) অপরাধ সংঘটনের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ না করিলে, কোন আদালত অত্র আইনের কোন অপরাধ আমলে লইবেন না।

(গ) অত্র আইনমতে আমলযোগ্য অপরাধের জন্য, অপরাধী ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী যে কোন দণ্ড প্রদানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বৈধ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

৮। অপরাধসমূহ আমল-অযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোষ-অযোগ্যঃ

এই আইনের প্রত্যেক অপরাধই আমল অযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোষ অযোগ্য হইবে।

৯। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতাঃ

[১] এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী কার্যকরীকরণার্থে সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

[২] এই ধারা মতে প্রণীত প্রত্যেকটি বিধি, প্রণয়নের পরপরই সংসদের নিকট পেশ করিতে হইবে। সংসদের অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বেই যদি সংসদ এই মর্মে একমত হন যে, প্রণীত বিধির রদবদল প্রয়োজন বা উহা প্রণয়ন সমীচীন নহে, তদনুযায়ী কেবলমাত্র রদবদলকৃত বিধি-ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে অথবা উহা আদৌ কার্যকরী হইবে না। তবে শর্ত যে, অনুরূপ রদবদলকৃত বা বাতিলকৃত বিধিবলে কোন ব্যবস্থা ইতিপূর্বে গৃহীত হইয়া থাকিলে, গৃহীত ব্যবস্থার বৈধতা খর্ব হইবে না।

নারী-নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩

[The Cruelty to Women (Deterrant Punishment) Ordinance, 1983]

(১৯৮৩ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশ)

[নারী-নির্যাতনে নিবর্তক শাস্তির বিধান করিবার অধ্যাদেশ]

যেহেতু নারী-নির্যাতনে নিবর্তক শাস্তির বিধান করা সমীচীন,

সেইহেতু, এক্ষণে, ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চের ঘোষণা অনুসারে এবং তৎপক্ষে তাঁহাকে সমর্থনকারী সকল ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ঘোষণা করিতেছেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ ঃ—(১) এই অধ্যাদেশকে 'নারী-নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

(২) যেখানেই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের উপর এবং বাংলাদেশে বর্তমানে বসবাসকারী অন্য যে কোন ব্যক্তির উপর, ইহা প্রযোজ্য হইবে।

২। এই অধ্যাদেশের অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য লাভ ঃ—বর্তমানে বলবৎ অন্য যে কোন আইনে অন্য কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

৩। সংজ্ঞা সমূহ ঃ—এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও অভিব্যক্তিসমূহ দণ্ডবিধি কোষের (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইনের) ন্যায় একই অর্থ বহন করিবে।

৪। বেআইনী বা দুর্নীত ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নারী অপবাহন বা অপহরণের দণ্ড ঃ—যে কেহ যে কোন বয়সের যে কোন নারীকে অপবাহন বা অপহরণ করে—

ক) এই অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ নারীকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অথবা বেআইনী বা দুর্নীত উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বা ব্যবহৃত করা হইবে অথবা ইহা সম্ভাব্য বলিয়া অবগত হইয়া যে, ঐরূপ নারীকে উপরোক্ত যে কোন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বা ব্যবহৃত করা হইবে ; অথবা

খ) এই অভিপ্রায়ে যে, ঐরূপ নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইবে অথবা ইহা জানিয়া যে তাহাকে উক্তরূপ বাধ্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গ) যাহাতে উক্ত নারীকে বে-আইনী সহবাসে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে, অথবা ইহা সম্ভাব্য বলিয়া অবগত হইয়া যে তাহাকে বে-আইনী সহবাসে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হইবে ;
সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানাযোগ্যও হইবে।

৫। নারী-ব্যবসা পরিচালনার দণ্ড ঃ—যে কেহ যে কোন বয়সের যে কোন নারী আমদানি বা রপ্তানি করে, বিক্রয় করে বা ভাড়া দেয় অথবা অন্যভাবে হস্তান্তর করে, বা ক্রয়, ভাড়া বা অন্যভাবে দখল করে, এই অভিপ্রায়ে যে উক্ত নারীকে বেশ্যাবৃত্তি বা কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ সহবাসের উদ্দেশ্যে বা কোন বেআইনী ও দুর্নীত উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বা ব্যবহৃত করা হইবে, অথবা ইহা সম্ভাব্য বলিয়া অবগত হইয়া যে, উক্ত নারীকে উপরোক্ত যে কোন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বা ব্যবহৃত করা হইবে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানাযোগ্যও হইবে।

ব্যাখ্যা-১ ঃ যখন কোন নারীকে কোন বেশ্যার নিকট বা কোন বেশ্যালয়ের মালিক বা ব্যবস্থাপক এমন কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয়, ভাড়া দেওয়া হয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করা হয়, তখন উক্ত নারীর অনুরূপ হস্তান্তরকারী ব্যক্তি, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এই অভিপ্রায়ে তাহাকে হস্তান্তর করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে যে, তাহাকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে।

ব্যাখ্যা-২ঃ যে কোন বেশ্যা, বা বেশ্যালয়ের অধিকারী বা ব্যবস্থাপনাকারী যে কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয়, ভাড়া বা অন্যভাবে দখল করিলে, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, সে এই অভিপ্রায়ে উক্ত নারীর দখল লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে যে, তাহাকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে।

৬। যৌতুকের জন্য মৃত্যু, ইত্যাদি ঘটানোর দণ্ডঃ— যে কেহ, কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর পিতামাতা, অভিভাবক বা আত্মীয় হইয়া যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটায় বা ঘটানোর প্রচেষ্টা করে বা গুরুতর আঘাত দেয়, সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং জরিমানাযোগ্যও হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—এই ধারায় "যৌতুক" বলিতে স্ত্রী বা স্ত্রীর পিতামাতা, অভিভাবক বা অন্য কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে বিবাহের পণ হিসাবে দাবিকৃত কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝায়, তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, দেনমোহর বা মোহর ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

৭। ধর্ষন ইত্যাদি করিতে যাইয়া মৃত্যু ঘটানোঃ— যে কেহ ধর্ষন করিতে যাইয়া বা ধর্ষনের প্রচেষ্টায় কোন নারীর মৃত্যু ঘটায় অথবা ধর্ষনের পর কোন নারীকে খুন করে, সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এবং জরিমানাযোগ্যও হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—ঐ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ধর্ষন করিতে যাইয়া বা ধর্ষনের প্রচেষ্টায় কোন নারীর মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যে ক্ষেত্রে উক্ত ধর্ষিতা বা যাহার উপর ধর্ষনের প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল এমন নারী ধর্ষনের ফলে বা ধর্ষনের প্রচেষ্টাকালে প্রদত্ত আঘাতের ফলে মারা যায়।

৮। ধর্ষন ইত্যাদি করিতে যাইয়া মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা বা গুরুতর আঘাত দেওয়াঃ—যে কেহ ধর্ষন বা ধর্ষনের প্রচেষ্টায় কোন নারীর মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা করে বা গুরুতর আঘাত দেয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য মেয়াদে সশ্রম কারদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, এবং জরিমানাযোগ্যও হইবে।

৯। অপরাধ সমূহের সহায়তাঃ—যে কেহ এই অধ্যাদেশের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের সহায়তা দান করে, সে যদি সহায়তার পরিণামে অপরাধটি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য বিধানকৃত শাস্তিতে দণ্ডনীয় হইবে।

১০। ১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইনের সংশোধনঃ— ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের (১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইনের) তফসিলে ৪ক অনুচ্ছেদের পরে নিম্নরূপ নতুন অনুচ্ছেদগুলি সন্নিবেশিত হইবে।, যথাঃ—

"৪খ। ১৯৮৩ সনের নারী-নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশের (১৯৮৩ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশের) অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ সমূহ।

৪গ। দণ্ডবিধি কোষের (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইনের) ৩৭৬ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ।"

বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে দরিদ্র মহিলাদের
বিবাহ বিচ্ছেদ : একটি ঘটনা সমীক্ষা

(সংগৃহীত তথ্য কেবলমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে)

উত্তরদাতার নাম :

উত্তরদাতার স্বামী/পিতার নাম :

উত্তরদাতার ঠিকানা :

বয়স :

সন্তান সংখ্যা (যদি থাকে) :

বিয়ের তারিখ (বৎসরসহ) :

নিজস্ব সম্পত্তি (যদি থাকে) :

জমির পরিমাণ : বাড়ী/ঘরের সংখ্যা :

বিবিধ :

বর্তমান কর্মস্থল :

পদবী : কাজের ধরণ :

মাসিক/দৈনিক বেতন :

পারিবারিক ব্যয় :

খাবার : কাপড়/চোপড় :

বিবিধ :

বিবাহ বিচ্ছেদের তারিখ/সময় :

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ :

১। অর্থনৈতিক :

১.১ ভরণ পোষনের অভাব
১.২ যৌতুক প্রথা/চাহিদা
১.৩ বেকারত্ব (স্বামীরক্ষেত্রে)
১.৪ বিবিধ

২। সামাজিক :

২.১ দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা
২.২ সামাজিক আচার আচরণ
২.৩ বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের ঘটনা
২.৪ বিবাহোত্তর প্রেমের ঘটনা
২.৫ গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে
২.৬ ঘর ছেড়ে বাইরে পুরুষের সাথে একত্রে কাজ করছে বলে
২.৭ অন্য নারীর সাথে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক অথবা সন্দেহ

৩। শারীরিক/দৈহিক :

৩.১ যৌন নির্যাতন বা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে কিনা
৩.২ পর পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক
৩.৩ স্বামী কর্তৃক স্ত্রী প্রহার
৩.৪ পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ
৩.৫ স্বামীর একাধিক বিয়ে
৩.৬ স্ত্রীর অসুস্থতা ও যৌন অক্ষমতা
৩.৭ স্বামীর অসুস্থতা ও যৌন অক্ষমতা
৩.৮ বিবিধ

৪। মানসিক :

৪.১ নিজেকে হীন মনে করা
৪.২ সমাজের সকলের সাথে মিশতে না পারা
৪.৩ রূপ গুনে অন্যের তুলনায় খারাপ
৪.৪ আকস্মিক কোন ঘটনার জন্যে
৪.৫ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা (মানসিক নির্যাতন)
৪.৬ বিবিধ

৫। পারিবারিক :

৫.১ শ্বশুরালয়ের পরিবারের সাথে অসামঞ্জস্যতা
৫.২ পরিবারের আত্মীয় স্বজনের সাথে অসামঞ্জস্যতা
৫.৩ স্বামীর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে স্ত্রীর ঝগড়া করার স্বভাব
৫.৪ উচ্চ শব্দে পারিবারিক কলহ
৫.৫ স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর নিকট পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ
৫.৬ বিবিধ

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া :

১। গ্রাম্য শালিস

২। আদালতের সিদ্ধান্ত (আইনের আশ্রয় গ্রহণ)

৩। গ্রাম্য গন্য মান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্ত

৩.১ ইতিবাচক ভূমিকা
৩.২ নেতিবাচক ভূমিকা

৪। শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল

৫। ধর্মীয় পদ্ধতি অনুসরণ (তিনবার তালাক উচ্চারণ)

৬। তালাক ছাড়া অন্য কোনও কারনে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়া/ পরিত্যাগ করে স্বামীর অন্যত্র গমন

বিবাহের প্রক্রিয়া :

১। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

২। যৌতুক ধার্য প্রক্রিয়া

৩। দেনমহর ধার্য প্রক্রিয়া

৪। গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত

৫। নিজেদের সিদ্ধান্ত

৬। গ্রাম্য শালিস

তালাকোত্তর তালাকপ্রাপ্তের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক/শারীরিক অবস্থা ও পারিবারিক অবস্থা :

১। অর্থনৈতিক অবস্থা :

১.১ তালাকের পর প্রাপ্য দেনমোহরের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা

হ্যাঁ .... না ....

১.২ জবাব না হলে, কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

হ্যাঁ ...... না ....

১.৩ হ্যাঁ হলে কিভাবে, কোথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

....

....

....

১.৪ আইনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কখনও অবগত করেছিল কিনা ?

হ্যাঁ .... না ....

১.৫ জবাব হ্যাঁ হলে কি ধরনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত করেছিল ?

____

____

১.৬ আইনের আশ্রয় (আইনানুগ ব্যবস্থা) নেয়ার পথে কেউ কখনও কোন বাধা বা ভয়ভীতি বা সামাজিক চাপের সৃষ্টি করেছিল কিনা ?
(টিক চিহ্ন দিন)

হ্যাঁ .... না ....

১.৭ হ্যাঁ হলে কি এবং কে ভয়ভীতি দেখিয়ে ছিল ?

কি ....

কে ....

১.৮ জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

হ্যাঁ .... না ....

১.৯ হ্যাঁ হলে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

২। সামাজিক অবস্থা :

২.১ তালাকের পর কার/কোথায় আশ্রয় নিয়েছে (টিক চিহ্ন দিন)

বাবা ...... মা .... ভাই ...... বোন ....

অন্যান্য আত্মীয় ....

২.২ সমাজের লোকজন তাঁকে কেমন দৃষ্টিতে দেখে ?

২.৩ দ্বিতীয় বিবাহের কোন ব্যবস্থা/জোর করা হচ্ছে কিনা ?

হ্যাঁ .... না ....

৩। মানসিক/শারীরিক অবস্থা :

৩.১ তালাক প্রাপ্ত নিজেকে কোন দৃষ্টিতে দেখে

৩.২ যৌন নির্যাতন/প্রলোভনের স্বীকার হচ্ছে কিনা ?

হ্যাঁ .... না ....

৪। পারিবারিক অবস্থা :

৪.১ পরিবারের সদস্যরা তালাকপ্রাপ্তকে কেমন দৃষ্টিতে দেখে ?